আমি রাইকিশোরী

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

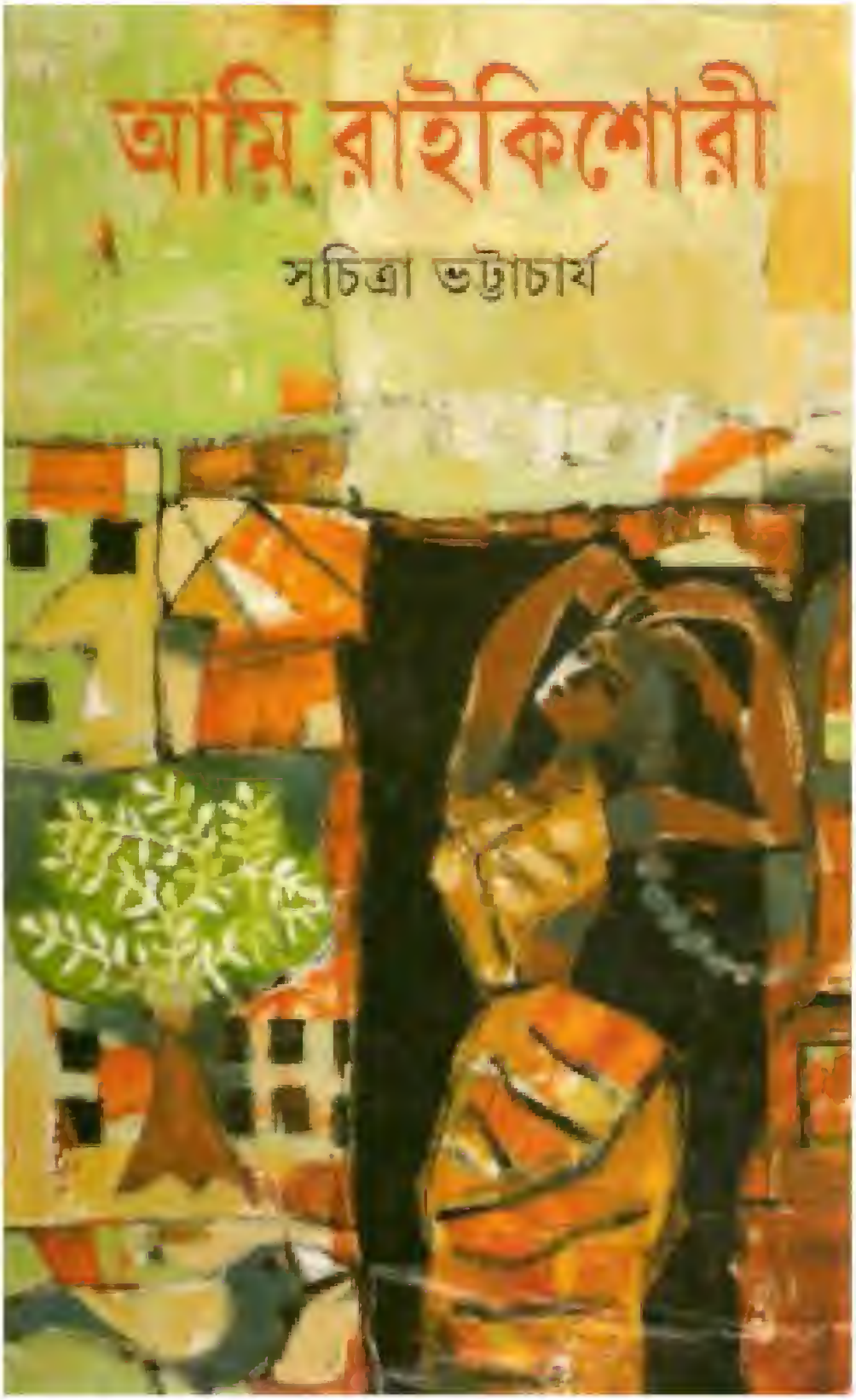

আমি রাইকিশোরী

আমি রাইকিশোরী মিত্র।...মিত্র! নাকি চৌধুরী? উহুঁ, কোনওটাই নয়। আমি রাই, শুধুই রাই...রাইকিশোরী। নামটা শুনেই ভাবতে বসবেন না আমি অপরূপ সুন্দরী, বৃন্দাবনের সেই কৃষ্ণ প্রেমিকাটির মতন। এক্কেবারেই নয়। নেহাতই সাধারণ, সাদাসাপটা চেহারা আমার। টিপিকাল বাঙালি মেয়েদের যেমন হয় আর কী। ফোলা ফোলা ঠোঁট, একটু চাপা গায়ের রং, গালদুটো টোপা টোপা। নাকটাও তেমন ধারালো নয়। তবে চোখ দুটো, বলতে নেই, বেশ সুন্দর। টানা, বড় বড়, চিতল হরিণের যেমন। কথাটা আমার নয়, লোকের। লোকে বলে আমার চোখ নাকি মুখের আগে কথা বলে, কাঁদে, হাসে। হবেও বা। মা বলে, এ চোখ আমি নাকি আমার ঠাকুমার কাছ থেকে পেয়েছি। তার সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়নি আমার। আমি জন্মাবার আগেই তিনি চলে গেছেন। ছবি দেখেছি। একটাই। বিয়ের পর পরই বোধহয় তোলা। একগাদা গয়নাগাঁটি পরে দাদুর সঙ্গে। দুজনেরই সে...ই ঐতিহাসিক পোজ। একজন লাজুক চোখে চেয়ারে বসা অধোমুখ নায়িকা, অন্যজন হাতলে ঠেস দিয়ে 'মুক্তি'র প্রমথেশ বড়ুয়া। আহা, কিছু রূপ ছিল বটে ঠাকুমার। তো সেই রূপ তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। বড়পিসি পেয়েছিল ডালিম ডালিম রং, ছোটপিসি হাত-পায়ের নিটোল গড়ন। বাবা চোখ কপাল আর নাকের খানিকটা। জেঠু ঠোঁট আর চিবুকের ভাগ। বাবা আর জেঠুর চেহারার বাদবাকিটা দাদুর মতন। লম্বা লম্বা হাত পা, লোমশ বুক, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া শরীরে সামান্য কুঁজো ভাব। আমাদের মধ্যে ভাইয়াটা দেখতে হুবহু বাবার মতন হয়েছে। গোঁফ দাড়ি উঠতে না উঠতে বুক জুড়ে কচি নরম ঘাস। দাদা অন্যরকম। ওর চেহারায় মা আর মামার বাড়ির আদল বেশি। গোলগাল, মিষ্টি মিষ্টি। আমারও বেশিটা মার মতন। একমাত্র চোখ দুটোই কীভাবে যেন ঠাকুমা থেকে বাবা হয়ে আমার কাছে চলে এসেছে। এভাবেই বুঝি পূর্ব পুরুষেরা নিজেদের টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে রেখে যায়।

মোট কথা হল, দেখতে আমি মন্দ নয়। চোখ না ফেরাতে পারার মতো না হলেও, লোকে তাকিয়ে দেখে। কোনও কোনও সময় ওই তাকানোটা আমার ভালই লাগে। কখনও কী বিরক্তি, কী বিরক্তি। এখনই যেমন। দেখুন না ঠিক আমার সামনে বসা লোকটাকে। পোশাক-আশাকে দিব্যি ভদ্রলোক। চোখে ফটোসান, কোলে ভি আই পি। দেখুন কেমন ফুক ফুক সিগারেট টানছে আর হ্যাংলা চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ছেলেদের কোন দৃষ্টির কী মানে আজকাল আমি খুব বুঝতে পারি। লোকটা আসলে আমাকে দেখছে না, একটা মেয়েমানুষ দেখছে। ষোলো থেকে সত্তর সব বয়সের পুরুষ মহিলা দেখলে চোখ দুটোকে বাগে রাখতে পারে না। কেউ ড্যাবড্যাব তাকায়, কেউ আড়ে-ঠারে। পুরুষদের নানান রকম দৃষ্টিতে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি আমি। গর্ত থেকে বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসার এই এক বিরাট প্লাস পয়েন্ট। কত কিছু যে জানছি, শিখছি। ছেলেরা চিরকাল মেয়েদের দেখবেই। নানান মন নিয়ে, নানান কামনায়। দেখুক গে যাক। আমার অস্বস্তির জন্য তো আর প্রকৃতির নিয়ম বদলে যেতে পারে না। ওদিকে দেখুন, কম্পার্টমেন্টের ওপাশের ওই লোকটাকে। ধুতি শার্ট পরা, চর্বিসার শরীর, মাথায় অল্প টাক।...ইস, কী লোভী চোখে সামনে বসা বউটাকে গিলছে। ব্লাউজ তুলে কোলের ঘ্যানঘেনে বাচ্চাটাকে বউটি দুধ খাওয়াচ্ছে। আপনিই বলুন, এ সময় কি পুরুষদের চোখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়? বেচারি যতবার আঁচল টেনে ভরাট স্তন ঢাকে, বাচ্চা গুঁতো মেরে সরিয়ে দেয়। দুবার ফটাফট চাঁটিও মারল ছেলের মাথায়। আধা গরিব মতন বউটার গায়ের দুপাশে আরও দুটো। একটা বছর পাঁচেকের, আরেকটা আরও ছোট। দুজনেই লেবু লজেন্সের জন্য সুর ধরেছে। বউটা কোনদিক সামলায়? তিন-তিনটে বাচ্চা, না নিজের লজ্জা? ওর পাশে বসা চোয়াড়ে মার্কা লোকটাকে দেখুন। নির্বিকার ঘুমোচ্ছে। নির্ঘাত স্বামী। মনে হয় কোনও কারখানা টারখানায় কাজ করে। হকারটা কাছে যেতে বউটা তাকে দুবার ডাকলও। আধখানা চোখ খুলে আবার বেমালুম ঢুলছে। বাচ্চা সামলানোর

তার কী দায় বলুন। পর পর তিনটেকে পৃথিবীতে এনে দিয়েছে এই না ঢের। বউ আছে কী জন্য? যাবতীয় ম্যাও সামলাতে...ওমা, কল্যাণী এসে গেল নাকি! কী কাণ্ড, এর মধ্যেই এতটা রাস্তা চলে এলাম! মনের ঝড় সময়কে কেমন উড়িয়ে চলে দেখুন।

কল্যাণীতে মাত্র চার-পাঁচ জন নামল। উঠল জনা দশেক। তার মধ্যে আবার তিনজন হকার। আজকাল লোকাল ট্রেনে প্যাসেঞ্জারের চেয়ে হকার বেশি। ধূপওয়ালা উঠেই একটা মোটা কাঠি জ্বালিয়ে ফেলেছে। আজ কামরায় লোক এত কম কেন বলুন তো? ওহো, আজ যে রবিবার। দ্যাখো কাণ্ড, এত কেন বেখেয়াল হয়ে গেছি? বাড়ি থেকে ওরকম পালিয়ে আসার জন্য কি? পালিয়ে আসাই তো। মাঝে মাঝে কী যে হয়ে যায় আমার! দাদাটা কী ভাবল কে জানে! বাবা মাও ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। অবাক হওয়ারই কথা। আচমকা কাল রাত্তিরে হাজির হয়েই, সন্ধেবেলায় হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে উলটোপালটা ভাবতে বসে গেছে। এভাবে সকলকে ভাবনায় ফেলার কোনও মানে হয়? নিজের দুগালে থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করছে। আমার সমস্যা আমারই। এর জন্য দুনিয়াসুদ্ধ লোককে কষ্ট দেওয়াটা অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। এখনও হঠাৎ হঠাৎ এমন সব বালিকাসুলভ কাজ করে ফেলি!

কাল অত রাতে আমাকে দেখে বাড়িসুদ্ধ সকলে থতমত। বাবা তো ঘাবড়ে টাবড়ে একশা—'কী রে, তুই? আজ? কী ব্যাপার?'

বোকার মতো হেসেছিলাম—'কেন, আসতে নেই?'

'—তা নয়। এ শনিবার তো তোর আসার কথা নয়...' আগে প্রতি সপ্তাহেই একবার চলে আসতাম। আজকাল পেরে উঠি না। শনিবার রাতে পৌঁছেই সোমবার ভোরে ফের রওনা দেওয়া। অসুবিধে হয়। সকালের লালগোলা শেয়ালদা পৌঁছোতে সেই সাড়ে দশটা। অতএব ভোরের প্রথম কৃষ্ণনগর লোকালই ভরসা। তিনি যদি লেট করেন তো হয়ে গেল। কিছুতেই দশটার মধ্যে অফিসে গিয়ে হাজিরা দেওয়া যায় না। তা ছাড়া একটা দিনের জন্য হুটোপুটি করে ছুটে আসাটাও বড় পরিশ্রমের।

শুধু বাবা নয়, কাল আমাকে দেখে মাও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। বার বার উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করে,—'তোর মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন রে? শরীর ঠিক আছে তো?'

আমার চোখ মুখ কি সত্যিই অন্যরকম লাগছিল? কাছের লোকরা অল্পতে বেশি ঘাবড়ে যায়। তার ওপর আমাকে নিয়ে যখন দুশ্চিন্তা তাদের আছেই। দাদাও আড়চোখে বারবার লক্ষ করছিল আমাকে। ভাবটা এমন, আমার হঠাৎ হাজির হওয়ার কারণটা চোখ দিয়েই বুঝে নেবে। মুখে অবশ্য বলছিল না কিছুই। সারা সকাল টেপে রবীন্দ্রসংগীত বাজাল। হেমন্ত আর দেবব্রত বিশ্বাসের গান। আজ ছুটির দিন। ওর বেলা অবধি ঘুমোনোর কথা। ওমা, কোন ভোরে বিছানা ছেড়েছে। উঠেই হাঁকডাক,—'রাই, শিগগির চা নিয়ে আয়।' মাকে বলল,—'আজ তোমার মেয়ের অনারে একটু ভাল খাওয়া দাওয়া হয়ে যাক। ঘি ভাত আর মাংস...'

ভাইয়া সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠেছে,—'মাংস নয়! চিংড়ি মাছের মালাই কারি। অনেক দিন চিংড়ি খাইনি।'

বাবা ভাইয়াকে বলল,—'তুই থাক বুড়ো। আজ আমি বরং বাজারে যাই।'

এ জন্যই বারবার কৃষ্ণনগরে চলে আসতে ইচ্ছে করে আমার। কী নরম একটা ভালবাসার উত্তাপ ছড়িয়ে থাকে এখানে। আমার বাবা, মা, দাদা, ভাই সবাই যেন শুধু দিতেই ব্যস্ত। কীভাবে যে যত্ন করে...! হোস্টেলের খাবার দাবার বেশ খারাপ। একবেলা মোটা চালের ভাত। আরেক বেলা রুটি। সঙ্গে যাহোক তরকারি, স্বচ্ছ ডালের জল আর ফ্যাসা কিংবা বেলে মাছের ঝাল। কত রকম অদ্ভুত অদ্ভুত মাছ খেতে শিখেছি কলকাতায় গিয়ে। আমাদের হোস্টেলে কদাচিৎ পাকা পোনা বা ইলিশ আসে। মাংস সপ্তাহে একদিন। কী করা যাবে। হোস্টেলের খাওয়া-দাওয়া সর্বত্রই এইরকম। বাড়ির লোকেরা সে কথা জানে। আমি বাড়ি এলেই তাই ভালমন্দ খাওয়ানোর ধুম পড়ে যায়। কী ভাল যে লাগে তখন!

চিংড়ি অবশ্য আজ পাওয়া যায়নি বাজারে। বদলে বাবা ইয়া ইয়া দুটো মুরগি এনে হাজির। আমি

মুরগি ভালবাসি। তো মা রান্নাঘরে মুরগি তোলে না বলে ভেতরের বারান্দায় উনুন বার করা হল। খাবার টেবিল সরিয়ে সেখানেই রান্নাবান্না। গরম গরম মাংসের ঝোল আর ভাত। মার রান্নায় জাদু আছে। দাদা, ভাইয়া গপাগপ খেতে লাগল। আমার ঠিক মন বসছিল না খাওয়ায়। মাথায় তখন একটাই চিন্তা। কেন বোকার মতো চলে এলাম কলকাতা থেকে! এখনও কেন এত বোকা রয়ে গেছি আমি! নিজেকে নিজে প্রাণভরে বকাবকি করছিলাম।

মা জিজ্ঞাসা করল,—'তোর কী হয়েছে বল তো? ভালভাবে খাচ্চিস না কেন? অফিসে কিছু হয়েছে?'

—'না তো।'

—'তবে?'

—'তবে আবার কী?'

—'হোস্টেলে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে?'

—'উহুঁ।' আমি প্রাণপণে ওদের মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে চাইলাম।

—'হোস্টেলে আবার কী হবে? ওখানে সবাই যে যার নিজের মনে থাকে মা। খায় দায়, ঘুমোয়, চাকরি বাকরি করে আর মাঝেমধ্যে শিশুদের মতো নিজেরা নিজেরা ঝগড়াঝাঁটি করে।'

—'তোর সঙ্গে কেউ ঝগড়া করেছে?'

—'দুর। আমার সঙ্গে কারুর ভাবই নেই তেমন, তো ঝগড়া।'

বাবা বলল,—'ভাব করিস না কেন? পাঁচজনের সঙ্গে মিশলেও তো মনটা ভাল লাগে।'

এর কী উত্তর দেব? বাবা মা তো আর জানে না আমি এখন আগের থেকে কত বেশি সহজ হয়ে গেছি। ওফ, প্রথম প্রথম হোস্টেলে গিয়ে আমার সে কী ভয়। কলকাতার কিছু চিনি না, কাউকে জানি না, রাস্তায় বেরোলে কেবলই মনে হয় এই বুঝি হারিয়ে গেলাম। হোস্টেল থেকে অফিস, অফিস থেকে হোস্টেল...এইটুকু যাতায়াত করতেই কী ভয়ানক শঙ্কা। অজানা কোথাও যাওয়ার কথা ভাবলেই বুক জুড়ে ডুবডুব ভয়। নিজেকে যে কী একা লাগত তখন। কত রাত নিঃশব্দে হু হু করে শুধু কেঁদেছি। কাঁদতাম আর ভাবতাম, আমার জীবনটাই কেন এরকম হয়ে গেল? এই দেখুন, কথায় কথায় কোথায় চলে যাচ্ছি। আমার এই এক স্বভাব। খালি পেছন ফিরে দেখা। কবে যে শুধুই সামনে তাকাতে শিখব! ট্রেনটা এখন কোথায় থামল দেখুন তো। ও হো, নৈহাটি। গাড়ির আগে সময় ছুটছে দেখি। শিয়ালদা পৌঁছতে আরও ঘণ্টাখানেক। এরকম ফাঁকা ট্রেনে বসে থাকতে দারুণ লাগে, তাই না? হু হু হাওয়া ছুটছে আমাল-দামাল। দুপাশের ঘন অন্ধকার কেটে ট্রেনটা যেন পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। চলো, চলো, চলো। কে কোথায় যাবে চলো। অন্ধকারকে পেছনে ফেলে ঠিক ঠিক আলোর স্টেশনে পৌঁছে দেব তোমাদের। আমার সামনে বসা লোকটা হালিশহরে নেমে গেছে। নিশ্চিন্ত। এ পাশটায় এখন আমি ছাড়া একজন, দুজন... মোট সাতজন। বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে মিলিয়ে একটা গোটা পরিবার উঠেছে। ওইদিকে যেখানে মোটা লোকটা বসে ছিল, সেখানে এখন একজোড়া কপোত কপোতী। ছেলেটা এমনভাবে ঝুঁকে আছে মেয়েটার দিকে যে মেয়েটার মুখ একটুও দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, প্রেম করা ব্যাপারটা কী রকম? কী এত কথা বলে প্রেমিক প্রেমিকারা? হাসছেন? না মশাই, সত্যি বলছি, আমি কেবল মনে মনেই একজনকে...বিশ্বাস করুন, প্রমিস, তাকে খালি স্বপ্নই দেখে গেলাম। আরবি ঘোড়ার সওয়ার হয়ে সে রাজপুত্তুর আমার কাছে এল আর কই! পরিবর্তে...থাক। অনিমেষের কথা ভাবতে আমার একটুও ভাল লাগে না। কার কথা তা হলে ভাবি? নীলাঞ্জন নয়, অনিমেষ নয়, তবে কি সিদ্ধার্থকে ভাবব? ছি, পুরুষের চিন্তা ছাড়া আর কিছু কি ভাবনা থাকতে নেই? আমাদের মতো মেয়েরা, বুঝলেন, এখনও বড্ড পরনির্ভর! কাউকে একটা জড়িয়ে, পরগাছা হয়েই বেঁচে থাকতে ভালবাসে বেশি। বোকার মতো নিজেদের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে...আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়? সিদ্ধার্থ হঠাৎ এভাবে আমার পেছনে লেগে গেছে কেন? আমার মতো একটা বিয়ে-ভাঙা মেয়ের জন্য...! কে জানে আমার ইতিহাস জানার পর বোধহয় করুণা জেগেছে মনে। কিংবা নিছক শারীরিক মোহ। অসম্ভব, ওই ফাঁদে আমি আর পা দিচ্ছি না। একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। যা খুশি ভাবুন আপনারা, আমার এখন সব মেঘের রংই সিঁদুরে মনে হয়। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা বড় দুঃসহ। যেরকমই হোক, অনিমেষকে নিয়ে

একটা রঙিন জীবনের কল্পনা তো ছিল। এক সময় যেমন সব মেয়ের থাকে। আসলে কী জানেন, আমাদের মনে ছেলেবেলা থেকে স্বামী, সংসার, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা বুনে দেওয়া হয়। অনেকটা মাকড়সার জাল বোনার মতো। খেলনাবাটি, পুতুল ঘর এ সব থেকেই সেই বুননের শুরু। শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় সূক্ষ্ম জালটা আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাই আমরা। ভাবি পাতলা সুতোয় ভাসমান এই ঘর গেরস্থালিই বুঝি আমার স্বর্গ। অবশ্য স্বর্গ বলে আদৌ যদি কিছু থাকে। সুতো ছিঁড়লে কে যে কোথায় ছিটকে যায়...না রে ভাই, সে জাল একবার যখন ছিঁড়ে গেছে নতুন করে আর তা বুনতে চাই না। বেশ আছি।

তবু একান্তই যদি নতুন করে শুরু করতে হয় তবে সিদ্ধার্থ কেন? কেন নীলাঞ্জন নয়? যার কথা কোনওদিন কারুকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি। যার কাছে কৈশোরের স্বপ্নগুলো মনে মনে গচ্ছিত রেখে একদিন চলে গিয়েছিলাম কৃষ্ণনগর ছেড়ে, অন্য এক নতুন ঠিকানায়! দেখুন, দেখুন কী নির্লজ্জ আমার মনটা দেখুন। পাছে সিদ্ধার্থ প্রেম নিবেদন করে বসে, সেই ভয়ে কাল পালিয়ে গিয়েছিলাম কলকাতা ছেড়ে। আজও কৃষ্ণনগর থেকে ছিটকে এসেছি নীলাঞ্জনের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কায়। তবু লজ্জাহীন ভাবনা জুড়ে সেই সিদ্ধার্থ আর নীলাঞ্জন। নীলাঞ্জন আর সিদ্ধার্থ। আমি আসলে একেবারেই একটা বিশ্রী রকমের নির্বোধ। অনিমেষ অত বড় ধাক্কাটা দেওয়ার পরও যার চৈতন্য ফেরে না...মেয়েরা বোধ হয় এরকমই। জেনে বুঝেও ফাঁদে পা দিতে কী যে আনন্দ মেয়েদের! কোথায় এখন আরও ভাল চাকরির চেষ্টা করব...নিজস্ব নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত একটা আস্তানার কথা ভাবব...সুন্দর নিশ্চয়তা আনব জীবনে তা নয় ঘেন্না, ঘেন্না, ঘেন্না এই ভাব ভাবনায়, ধিক্কার আমার মতিগতিকে...।

উহ্, কী কুৎসিত বেসুরো গান ধরেছে অন্ধ ভিখিরিটা শুনুন। প্রতিটি লাইনের শেষে আবার হাড্ডিসার বাচ্চা সঙ্গীটির নাকি গলার দোহারকি। কেত্তনের সঙ্গে নজরুলের রোমান্টিক গান। ভাবা যায়! এ গাইল 'ফোটে যে ফুল আঁধার রা আ আ তে', সঙ্গে সঙ্গে ও পোঁ ধরল, 'রাতে এ এহ্।' অসহ্য। ব্যারাকপুর থেকে আবার একটি ইঁদুর শিকারি উঠেছে। তার সুর আর ভিখিরির সুর মিলেমিশে বিচিত্র সব পঙ্‌ক্তি হয়ে যাচ্ছে দেখুন। অন্ধকারে এসেছিলেম...কেটে দিল, কেটে দিল, সব কিছু কেটে দিল...থাকতে আঁধার যাই চলে...যাবার আগে র‍্যাটোকিল্ নিতে ভুলবেন না...ক্ষণকালের হয়েছিলে...এসেছিল, সে আপনার বিছানায় এসেছিল... চিরকালের নাই হলে...ছারপোকাকে থাকতে দেবেন না...খবরদার। ব্যারাকপুর থেকেই বেশ ভিড় হতে শুরু করেছে কামরায়। এখন বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে। এক মহিলা আমাদের সিট দুটোর মাঝখানে দিব্যি কায়দা করে জায়গা করে নিয়েছে। ভাগ্যিস জানলার ধারটা একটু আগে পেয়ে গেছি। ভিখিরিটা মহিলাকে ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। বাচ্চাটা সামনে এসে কটকটি বাজাল কটাকট কটাকট। সুর, তাল কোনও জ্ঞানই নেই। হাত পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দেব না, দেব না, কিছুতেই আমি ওদের পয়সা দেব না। বাইরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে থাকব এখন। শুধু তো আর অন্ধকার নয়। বাইরে কোথাও কোথাও আলোও আছে, আবছা। বেলঘরিয়া দমদমের মাঝখানে, সিগনালে আটকে আমার কৃষ্ণনগর লোকাল। একটু দূরেই সার সার আলো। বাঁদিকের পাগলাগারদ আর কালো ঝুল গাছগাছালিগুলো পেরিয়ে গেলেই ঝলমলে আরেকটা স্টেশন এসে যাবে। তারপর কলকাতা আর কতক্ষণ।

দুই

স্টিফেন হাউসের পেছন দিয়ে বেরিয়ে, ডানদিকে ঘুরলে, সামনে মিশন রো। দুপুর বেলার অফিস পাড়া এখন নিজস্ব নিয়মে ব্যস্ত। উজ্জ্বল রোদে যেমন তেমন সাঁতার কাটছে গাড়িঘোড়া, মানুষজন। আকাশ আজ চকচকে নীল। সি.টি.সি-র সামনে সিঁড়ির ধাপে এক মনে লাইটার সারাচ্ছে সেই বুড়ো লোকটা। চোখে পুরনো আমলের গোল চশমা, আধময়লা ধুতি, রংজ্বলা নীল ফুল শার্ট। লোকটার বোধ হয় ওই একসেট জামাকাপড়ই আছে। ম্যাঙ্গো লেনের মুখে খাবারওয়ালারা সার সার দাঁড়িয়ে, বসে। অফিস টাইমে এ সব অঞ্চলে কত রকম যে খাবার পাওয়া যায়। কাটা ফল থেকে শুরু করে ডিম পাঁউরুটি, ইডলি ধোসা ঢাকাই বাখরখানি পর্যন্ত। একেক মানুষের জিভ একেক রকম। ফুটপাথে লোহার

টুকটাক যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে বসেছে একজন। তার পাশে 'হরেক মাল সাড়ে ছ'টাকা।' গোটা কয়েক স্ট্রিট হকারকে পেরিয়ে এসে ডোমা জিজ্ঞাসা করল,—'কোথায় যাবে আজ? সাউথ ইন্ডিয়ান, না চাইনিজ?'

মেয়েটা আজ ওদের তিব্বতি পোশাক পরেছে। কী যেন ছাই নাম এই ড্রেসটার? ডোমা বলেছিল। ভুলে গেছি। প্রায়ই ও অফিসে এই কস্টিউমটা পরে আসে। গাঢ় নীল মোটা কাপড়ে তৈরি গলা থেকে পা অবধি লম্বা এক ধরনের কোট মতন। ওদের দেশের বিবাহিত মহিলারা নাকি এর সঙ্গে কোমরে একটা ছোট্ট অ্যাপ্রনগোছের জড়ায়। ডোমাকে ওর এই দেশীয় পোশাকেই সবথেকে বেশি মিষ্টি লাগে।

ডোমার কথায় ক্রিশ্চিন মাথা দোলাল। ওর আজ ড্রেস প্যাডল পুশার, ব্যাগি শার্ট। নীলচে চোখের এই মেয়েটা মাঝে মাঝে আবার শাড়িও পরে—'অনেক দিন হোল ইন দা ওয়ালে যাওয়া হয়নি। লেটস গো দেয়ার।'

জনের দোকানটার নিজস্ব নামকরণ করে নিয়েছে ক্রিশ্চিন। ম্যাঙ্গো লেনের ডানদিক দিয়ে যে গলিটা ভেতরে ঢুকে গেছে, তার ভেতরে একটা গলি, তারপর আরেকটা। শেষে দু-হাত চওড়া এক গলিতে জনের রেস্তোরাঁ কাম ঘরবাড়ি। দুধারে উঁচু লম্বা পাঁচিল। পেচ্ছাপের গন্ধে পুরো জায়গাটা সারাক্ষণ ঝাঁ ঝাঁ করছে। সেই উৎকট গন্ধ টপকে আমরা পৌঁছে গেছি জনের দরজায়।

বিশাল পাঁচিলের গায়ে ফালি কাঠের এক গরিব দরজা। খোলা থাকলে জায়গাটাকে গর্তের মতোই লাগে। দেওয়ালের মধ্যে গর্ত...সার্থক নামকরণ বটে। মাথা নিচু করে ঢোকার পর ভেতরে মাটির উঠোন। একদল মোরগা মুরগি বাচ্চাদের পল্টন নিয়ে অষ্ট প্রহর প্রভুর উঠোন পাহারা দেয়। তারপর সময় এলে প্রভুই তাদের ছুরির ফলায় তুলে দেয়। দুধাপ দাঁতাল সিঁড়ি ভেঙে বড় মাপের একখানা সাহেবি আমলের ঘর। ঘরের মাঝ বরাবর পর্দা টাঙিয়ে রেস্তোরাঁ আর সংসারকে আলাদা করে নিয়েছে জন। ওপাশের ওইটুকু জায়গায় বউ-বাচ্চা নিয়ে কী করে যে থাকে। রাতে নিশ্চয়ই এদিককার চেয়ার টেবিল সরিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা হয়। কলকাতার ঠিক পাঁজরের খাঁজে, এত অফিস কাছারির মাঝে, মানুষের এরকম বসবাস আছে ভাবাই যায় না। রোজ কতরকম ভাবে যে কলকাতাকে আবিষ্কার করছি!

টিফিনে বেশ কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারী পুরুষ এখানে লাঞ্চ সারতে আসে। তুলনায় অন্য জাতের মানুষ কম। এ সব জায়গায় আমার নিজেকে কেমন 'হংস মধ্যে বকো যথা' মনে হয়। এদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ সব কিছুর থেকেই আমি কত আলাদা। প্রথম প্রথম বেদম অস্বস্তি হত। ইংরিজি বলতে গিয়ে কথা আটকে যায়, তো তো করি, বারবার তাঁতের শাড়ির আঁচল টেনে বুক ঢাকি! মজা লাগছে শুনতে, তাই না? দেখতাম, জল থেকে তুলে হঠাৎ ডাঙায় ফেলে দিলে আপনার কেমন লাগত! এখন অনেকটাই রপ্ত করে ফেলেছি নিজেকে। প্লিট দিয়ে আঁচলটাকে দিব্যি কাঁধের ওপর সাজিয়ে রাখি। মোটেই বারবার ডান হাতে আঁচল টানি না। গত মাসে একটা সোনালি প্রজাপতি ব্রোচও কিনে ফেলেছি।

ওই যে, কোনার টেবিলে গোটা পাঁচেক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে হইহই করছে বসে, ওদের দেখে আগে আমার বুক কাঁপত। অনাত্মীয়, অচেনা পরিবেশে কার না বুক ঢিপঢিপ করে? তবে হ্যাটস অফ টু ডোমা, ক্রিশ্চিন অ্যান্ড শার্লি। ওরা আমাকে সহজ করে কাছে টেনে না নিলে, আমি কেঁদেই মরে যেতাম। শার্লিটা আজ অ্যাবসেন্ট। আমরা তিনজন মাঝখানের টেবিলে বসেছি। বাঁ ধারে একা একজন। ঢাউস ব্যাগ নামানো রয়েছে পাশে। আজকাল এদের দেখেই চিনে ফেলতে পারি। নির্ঘাত মেডিকেল কি সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ। ক্ষুধার্ত বালকের মতো এরা খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাশে দুই মারোয়াড়িতনয় গোগ্রাসে শুয়োর গিলছে। বাজি ধরতে পারি, এদের বাড়িতে আমিষ ঢোকে না। মারোয়াড়িদের নতুন জেনারেশন পুরোপুরি ভোলচাল পালটে ফেলেছে। গদিতে বসা ভুঁড়িওয়ালা লোক মানেই মারোয়াড়ি, এই ধারণা ইদানীং অচল। উড়ুউড়ু চুল টিঙটিঙে রোগা ছেলেদুটো ককটেল সসেজ চিবোচ্ছে। বাহ্, বেশ বেশ। ভুরু কোঁচকাচ্ছেন কেন? ভাবছেন খুব কুসংস্কার আছে আমার? তাই তো? ভুল। এককালে অনেক কিছু মানতাম টানতাম! শৈশব থেকে রক্তের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে! সত্যি সত্যি যুক্তির জোয়ার যখন আসে অর্থহীন শিক্ষা, ভাবনারা খড়কুটোর মতো কোথায় ভেসে যায়। যেতে বাধ্য। এই তো খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেই দেখুন না, আমার আর আজকাল কোনও সংস্কারই নেই। জিভে যা ভাল লাগে, খাই। এর মধ্যে আর কোনও দ্বিতীয় কথা নেই।

তা হলে একটা মজার ঘটনা বলি শুনুন। একদিন অফিসে আমার বান্ধবীরা বাড়ি থেকে টিফিন এনেছে। ভাগাভাগি করে খাওয়া হবে। আমি আর কী করি? বাড়িই নেই তো টিফিন বানানো। বদরিকে দিয়ে কিছু পাকোড়া আনিয়ে নিলাম নীচ থেকে। স্টেনোরুমে গোল হয়ে বসেছি। ক্রিশ্চিন বার করল পরোটা, কাবাব, ডোমা ফ্রেঞ্চ স্যালাড, শার্লি চপসুই। দিব্যি গপগপ পরোটা মাংস গিলে চলেছি। কিছু বুঝতে পারিনি। মাংসের আঁশগুলো সামান্য মোটা লাগল যেন।

ক্রিশ্চিন হি হি হাসতে শুরু করল আমচকা,—'রাই, ডু ইউ নো হোয়াট ইউ হ্যাভ টেকেন জাস্ট নাউ?'

—'কাবাব?'

—'ইয়াহ্। বাট হুইচ কাবাব?' শার্লি চোখ মটকাল।

—'কী?'

ডোমা ঠোঁটে আঙুল চেপে হাসল,—'বিফ, ম্যাডাম, বিফ।'

—'সো হোয়াট?' আমিও স্মার্ট মেমসাহেব তখন,—'ইট ওয়াজ সো ডিলিইশাস।'

তো আমার নতুন বান্ধবীরা হল এরকম। সরল, সাদামাটা। সংস্কার আছে, গোঁড়ামি নেই। মেয়েগুলোর কাছ থেকে আরও কত কিছু যে শেখার আছে আমার। এদের সঙ্গে মেশার জন্যই কি না জানি না, মানুষের গড়া ধর্মীয় গোঁড়ামিগুলো ইদানীং আর আমাকে তেমন স্পর্শ করতে পারে না। বিয়ের সময় যে সুন্দর সুন্দর মন্ত্র পড়া হয়েছিল, দমকা ধাক্কায় তাই কোথায় ছিটকে গেল!

বেঁটেখাটো চেহারার জন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চিন দেশের এই মানুষটির পাতলা গোঁফে সদাই নরম হাসি।

—'আজ কী দেব তোমাদের?

ডোমা আমার দিকে তাকাল, 'পর্ক চাউমিন?'

আজকাল এদের পাল্লায় পড়ে প্রায়ই পর্ক হ্যাম খাচ্ছি। মা জানলে হার্টফেল করবে। কৃষ্ণনগরেও অবশ্য চাইনিজ ফুড চালু হয়ে গেছে। তবে জনের বউ-এর রান্না তুলনাহীন। দামও সস্তা। পাঁচ টাকায় এক প্লেট চাউমিন। ভাল পেট ভরে যায়।

ডোমা বলল,—'চপস্টিক দিও।'

ক্রিশ্চিন বলল,—'আমাকেও।'

আমি এখনও এদের মতো চপস্টিক দিয়ে খেতে পারি না। জন জানে। সুন্দর করে হাসল তাই,—'অ্যান্ড ইউ ফর্ক অ্যান্ড স্পুন।'

—'রাইট। আই মাইসেলফ ইজ ফর্ক অ্যান্ড স্পুন।'

ডোমা একটা সিনে অ্যাডভান্স খুলে বসেছে। নতুন একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে এল। পরনে টাইট জিনস, জোব্বা গেঞ্জি। কোনার দিকের টেবিলটার দিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল,—'হাই ক্রিশ্চিন।'

—'হাই রিচি। হাউ'জ লাইফ?' ক্রিশ্চিন হাত তুলল। এই ছেলেটির গায়ের রং বেশ কালো। ওদিকের পাঁচজনের মধ্যেও দুজনের মাত্র সাহেব রং, দুজন আধা সাহেব, একজন প্রায় নতুন ছেলেটির মতো।

রিচি বন্ধুদের টেবিলের দিকে এগোল,—'হাউ'জ ম্যাথুজ?'

—'ও ফাইন। হি ইজ লিভিং নেক্সট মানথ।'

—'ইজ ইট?'

ক্রিশ্চিন ঝিকঝিক হাসল।

—'অ্যান্ড ইউ বেবি?'

—'ওয়েল। লেট হিম সেটল ডাউন ফার্স্ট।'

বাবা রে মা, ছেলে মেয়ে দুটো কী তুফানগতিতে ইংরিজি বলে চলেছে। মনে হয় ভার্ব-টার্বগুলোকে টকাটক উড়িয়ে দিচ্ছে। আগে ওদের কথা এক বর্ণ বুঝতে পারতাম না। মনে হত গ্রিক কি হিব্রু বলছে বুঝি। মাসখানে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস করে অনেকটা আয়ত্ত করেছি। তাও মাঝে মাঝে আটকে যায়।

দু-চারটে বাক্যের পর খেই হারিয়ে ফেলি। ঠিক ঠিক শব্দগুলোকে কিছুতেই খুঁজে পাই না। গ্রামার সম্পর্কেও সচেতনতা এসে যায়। তবে এরা আমার ভুল ইংরিজির জন্য হাসাহাসি তো করেই না, বরং প্রায়ই আমার কাছে বাংলা শিখতে চায়। আমার সুবিধের জন্য টেনে টেনে কথা বলে। এমন কী আমার থেকে ভাল হিন্দিও বলতে পারে। আমি একেবারে হিন্দির মা বাপ। ভাবলে এত লজ্জা করে।

ক্রিশ্চিন বন্ধুর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলেই চলেছে,—'ইউ নো, ডিক অলসো হ্যাড আ লঙ্ ড্রিম ফর সিডনি। ড্যাড ওয়াজ অলসো অন হিজ লেগস। বাট ইউ নো আওয়ার প্রবলেম...'

—'ইওর গ্রানপা?'

—'ইহ, দ্যাট ফুল ওল্ড ম্যান। হি ওন্ট লিভ দিস ডার্টি সিটি। সিম্পলি ক্রেজি...'

ডিক ক্রিশ্চিনের দাদা।

রিচি মুখ দিয়ে কিছু উদ্ভট শব্দ বার করল,—'তা হলে যতদিন না বুড়ো মরে অপেক্ষা করো...'

—'উই'ল হ্যাভ টু।' ক্রিশ্চিন কাঁধ নাচাল,—'দাদুকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না, ওখানে গেলে আমাদের কত সুবিধে। চাকরি, ব্যবসা, জায়গা, জমি...এ দেশ আমাদের কী দিয়েছে? গভর্নমেন্ট তো ফিরেও তাকায় না...'

ক্রিশ্চিনের ফর্সা মুখ উত্তেজনায় টুকটুকে লাল। এ ক্রিশ্চিনকে আমি চিনি না। কী দুঃখ ওদের? কেন ওরা এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়? ঘৃণা করে শহরটাকে?

ক্রিশ্চিনের কথায় এবার তাল দিচ্ছে রিচির বন্ধুরা,—'রাইট। সমস্ত মাইনরিটি ক্লাসের জন্য গভর্নমেন্টের চিন্তা-ভাবনা আছে। এক্সেপ্টিং আস। কেন থাকব? আমিও চেষ্টা করছি জব ভাউচার পেলেই চলে যাব।'

উত্তেজিত ক্রিশ্চিন বন্ধুদের টেবিলে চলে গেছে। ডোমা আড়চোখে সেদিকে তাকাল।

—'ডোমা, ওরা সবাই অস্ট্রেলিয়ায় চলে যেতে চায় কেন?'

—'গড নোজ।' ডোমা ঠোঁট ওলটাল।

উত্তর কি সত্যি কেউ জানে না? বহু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইদানীং এদেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। কেন? শুধুই কি জমিজমা, চাকরির আশায়? না অন্য কোনও অভিমান আছে?

আবার গলা নিচু করলাম,—'ম্যাথুজ কবে যাচ্ছে?'

—'প্রোবাবলি সেভেনটিন্থ অফ নেক্সট মান্থ। ওর জব ভাউচার এসে গেছে।'

—'তার আগে কি ক্রিশ্চিনকে বিয়ে করবে?'

—'হয়তো। এনগেজমেন্ট যখন হয়ে গেছে...'

মনটা খারাপ হয়ে গেল। ম্যাথুজ গেলে ক্রিশ্চিনও এক সময় না এক সময় চলে যাবে। একটা ভাল বন্ধু হারিয়ে ফেলব...

ডোমা ম্যাগাজিন থেকে মুখ তুলল,—'ওরা কেন চলে যায় জানি না। তবে শার্লিদের দ্যাখো। ওরাও তো এত ঘর চাইনিজ আছে। বাট দে নেভার থিংক অফ গোয়িং ব্যাক টু চায়না। ডুই ইউ নো, হোয়েন ডিড দে কাম?'

—'কবে?'

—'প্রায় আড়াইশো বছর আগে। ওদের প্রথম অ্যানসেস্টর যিনি এসেছিলেন, হি ওয়াজ এ পাইরেট। তার মাথার দাম নাকি তখন ক্যান্টনে ছিল এক লক্ষ ইয়েন।'

—'তাই?'

—'হুঁউ। খান সত্তর নাকি খুন করেছিলেন। হি ওয়াজ এ টেরর ইন সাউথ চায়না সি। ওরা কিন্তু তাঁর জন্য বেশ গর্বিত। ওরকম একটা বীরের বংশধর বলে...'

একটু ডোমার পেছনে লাগি। ঠোঁট কামড়ে হাসলাম,—'ওরা তো বীরের জাত। আর তোমরা? পায়াস...'

—'হেই, ডোন্ট টিজ মি।' ডোমা ছদ্ম ধমক দিল,—'ইউ নো, উই আর অলসো রিফিউজিস। এখানে আমরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ে তুলেছি। সকলেরই উচিত...'

সত্যি, ভাবলে অবাক হতে হয়, এই শার্লি বা ডোমাদের শিকড় কীভাবে আস্তে আস্তে ভারতের

মাটিতে ছড়িয়ে গেছে। ক্রিশ্চিনরা কোনওদিন শিকড়টাকে ছড়ানোর সুযোগ দিল না। যাদের মূলে প্রাণরস কম, তারা তো চিরকাল নিজেদের অনাদৃত মনে করবেই। আমি যেমন। তবে আমি ক্রিশ্চিনদের মতো পালাব না। আশ্চর্য! কত বদলে গেছি দেখুন। এই আমিই না একদিন চলে যেতে চেয়েছিলাম শিকড়টাকে উপড়ে ফেলে! পৃথিবী থেকেই পালাতে চেয়েছিলাম।

ডোমা অমিতাভ বচ্চনের একটা ফুল বাস্ট মেলে ধরল,—'লুক্, শার্লিজ হিরো। সো রাগেড...'

শার্লি মেয়েটা খুব হিন্দি ফিল্ম দেখে। একটু গোল চেহারা, গায়ের রং কাঁচা হলুদ। বড় বড় ঝুলের স্কার্ট-ব্লাউজ পরে। মাঝে মধ্যে পাজামা-কুর্তা। শার্লির পায়ের কাফ দুটো ভারী সুন্দর। পুরুষ্টু থোড়ের মতন। ক্ষুদি ক্ষুদি চেরা চোখ আর চ্যাপটা নাকে হাসলে মেয়েটাকে এত সুন্দর দেখায়। তবে চেহারা যে তুলনায় ভারী, সেই অনুপাতে বুক দুটো ছোট্ট। কিশোরীর স্তন যেমন। বরং ডোমা, ক্রিশ্চিনের ফিগারে অনেক বেশি যৌবন। তবে যাই বলুন, আমাদের দেশের মেয়েদের মতো শরীর কিংবা বুকের গড়ন তেমন বিশেষ দেখলাম না। না, তর্ক করবেন না। এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত।

কার কথা বলতে কোথায় চলে যাচ্ছি। শার্লির গল্প বলছিলাম। তো হ্যাঁ, মেয়েটা সব মিলিয়ে ডল-পুতুল ডল-পুতুল। ডোমার মুখেও পুতুল ভাব কিছুটা আছে। তবে ওর মতো নয়। আমাদের পুতুল পুতুল সেই শার্লি হিন্দি সিনেমার পোকা। ইংরিজিরও। সিলভেস্টার স্টালোন আর অমিতাভ বচ্চন ওর স্বপ্ন-প্রেমিক। আরেকজনও আছে। ওর বয়ফ্রেন্ড। চি সান বিং, না ওই ধরনের কী একটা নাম। ওরাও শিগগির বিয়ে করবে।

জন এখনও খাবার দিল না। এদিকে ভাজা খাবারের গন্ধে ম ম চারিদিক। ক্রিশ্চিন এখনও বন্ধুদের টেবিলে। কত সহজেই ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারে এরা বন্ধুর মতন। আমাদেব কথা ভাবুন। ছেলে মেয়েদের সহজ বন্ধুত্বকে আমরা মেনে নিতে পারি কি? এখনও?

ডোমার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিলাম,—'অনেকক্ষণ বচ্চনকে দেখেছ। এবার তোমার কথা বলো।'

—'অ্যাবাউট হোয়াট?'

—'আহা, জানো না যেন। সানি কেমন আছে? অনেকদিন ছুটির পর তোমাকে নিতে আসছে না...।'

ডোমার শুঁয়োপোকা রং হালকা ভুরু জোড়া চওড়া কপালে লাফালাফি করে নিল খানিক। ফোলা গালে লাজুক হাসি,—'থিম্পু গিয়েছিল পেরেন্টসদের কাছে...'

—'সবাই তো বিয়ে করছে। শার্লি, ক্রিশ্চিন। তোমারটা কবে? থিম্পু আর লাসার মিলন?'

ঈষৎ চৌকো তিব্বতি রমণীর মুখে এবার রঙিন আভা।—'নট ডিসাইডেড ইয়েট। তা ছাড়া আর একটু মাইনে কড়ি বাড়ুক। লিভারসে একটা চান্স পেতে পারি...'

—'তুমিও চলে যাবে?' মুহূর্তে আমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

—'বাহ্, এখানে আটশো টাকায় পড়ে থাকলে চলবে নাকি? শালিও তো চেষ্টা করছে রেমিংটনে...'

বুকের কাছটা কেমন যেন করছে আমার। শুধু ওরা চলে যাবেই বলে কি? আমি কবে ওদের মতো একটা ভাল চাকরি পাব? এভাবে মাত্র ছশো টাকায়...। আমার সত্যিই একটা ভাল চাকরির খুব দরকার। এই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বোধটা আরও কয়েকটা বছর আগে যদি আসত। এত দুর্ভোগ হত না তা হলে। স্বাধীনতাতেই বুঝি মানুষের প্রকৃত মুক্তি। উদার আকাশে ডানামেলা সেই মুক্তি কবে পাব আমি? এই মেয়েগুলোকে দেখুন। শিখুন এদের কাছ থেকে কিছু। কত স্বাধীন এই মেয়েগুলো, পাখির মতো, ফুলের মতো। নিজেদের সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে জানে। নিজস্ব অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ছাড়া ঘর-সংসার বসানোর কথা এরা ভাবতেও পারে না। বেশির ভাগ বাঙালি মেয়ে যদি এভাবে ভাবতে জানত! আঘাত না পাওয়া পর্যন্ত তারা বুঝতেই পারে না পরগাছা জীবন কত অসহায়।

বাবাঃ, জন এতক্ষণে খাবার দিয়েছে। গরম নুডলস বেয়ে গন্ধ উঠছে ভুরভুর। পেটে যেন বঁড়শির টান পড়ছে। চোখের সামনে খাবার এলে মানুষ খিদের তীব্রতা আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

খেতে খেতে ক্রিশ্চিন জিজ্ঞাসা করল,—'রাই, এত চুপচাপ কেন? কী ভাবছ?'

—'ডোন্ট ডিস্টার্ব হার।' ডোমা ফোড়ন কাটল,—'রাই এখন বয়ফ্রেন্ড-এর কথা ভাবছে। একটু

আগেই আমাকে...'

—'ইজ ইট? কার কথা ভাবছ রাই? সিনহা?'

ধপাস করে পাহাড়চূড়া থেকে কাদায় পড়ে গেলাম। রাম নয়, অর্জুন নয়, কোত্থেকে এক ছাগলকুমার এসে হাজির! হাসতে গিয়ে প্রায় বিষম খেয়ে ফেলি।

—'আর ইউ টকিং অ্যাবাউট দ্যাট স্মল গোট?'

—'ডোন্ট বি সো ক্রুয়েল। আমি দেখেছি ও অফিসের সব কাজ ফেলে শুধু তোমার দিকেই তাকিয়ে থাকে।'

—'সিনহা সেদিন রাই-এর চুলের প্রশংসা করছিল'

—'সিনহা সেদিন রাই-এর ঠোঁটের প্রশংসা করছিল...'

—'লেগ পুলিং হচ্ছে?' চোখ ঘোরালাম,—'আমি একদিন ঠিক তোমাদের সিনহার কান মুলে দেব।'

হালকাভাবে বলছি বটে, তবে ওই অজয় সিনহার বোকা বোকা আচরণ আমার আদৌ পছন্দ নয়। অফিসে জয়েন করার পর থেকেই ওই ব্যক্তিটি আমার পেছনে ঘুর ঘুর করছে। কথায় কথায় রিসেপশন কাউন্টারেব সামনে এসে দাঁড়ায়। হাসে অবোধের মতো। কিছু লোক আছে, মেয়ে দেখলেই কেমন কাঙাল হয়ে যায়। তবে সিনহা আমার সমস্যা নয়। আমি ঘাবড়ে আছি আরেকজনকে নিয়ে। কীভাবে যে সিদ্ধার্থকে এড়ানো যায়।

ক্রিশ্চিন আচমকা প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা রাই, হোয়াটস দা মিনিং অফ ইওর নেম?'

খাওয়া শেষ করে মুখ মুছলাম,—'রাই মিনস রাধা। শি ওয়াজ ওয়ান অফ আওয়ার রিলিজিয়াস হিরোইনস। মহিলার বড় দুঃখ ছিল । ইউ নো, হার হাজব্যান্ড, আয়ান ঘোষ ওয়াজ অ্যান ইম্পোর্টেন্ট ওয়ান। কৃষ্ণ নামের এক ভগবানের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়! ডেন্স অ্যান্ড রিয়েল লাভ।'

ডোমা ভুরু নাচাল,—'আই নো সামথিং অ্যাবাউট ইওর লর্ড কৃষ্ণা। হি ওয়াজ এ গ্রেট ফ্লার্ট।'

—'রাইট। কৃষ্ণের হাজার এক প্রেমিকা। তবে রাধা বেচারি তাকে ভালবাসত সব থেকে বেশি। শি ওয়াজ ম্যাড আফটার হিম।'

—'দেন?'

—'তারপর আর কী? রাধাকে ফেলে কৃষ্ণ একদিন রাজা হওয়ার জন্য মথুরা চলে গেল। অ্যান্ড হি নেভার কেম ব্যাক।'

—'রাধার কী হল?'

—'কেঁদে কেঁদেই কাটাল জীবনটা। তার কথা আমাদের রাইটাররা আর কেউ লেখেনি। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওই ইম্পোর্টেন্ট হাজব্যান্ড-এর সঙ্গেই লাইফেব বাকিটা...'

—'কৃষ্ণা ডিডন'ট কাম ব্যাক টু হার?'

—'নেভার। যে রাধাকে সে অত ভালবাসত তার কাছে আর কোনওদিন ফিরে আসেনি। অ্যান্ড দিস ইজ দা অবভিয়াস ফেট অফ আওয়ার হিরোইনস।'

—'স্ট্রেঞ্জ।'

—'আরও স্ট্রেঞ্জ কী জানো? হি হ্যাড সো মেনি ওয়াইভস। বাট হি নেভার থট অফ ম্যারিং রাধা।'

ডোমা আমার কনুই-এ চিমটি কাটল,—'তোমার কৃষ্ণ কোথায়? আছে, না ছেড়ে চলে গেছে?'

হায়রে, তোরা যদি জানতিস, আমার কৃষ্ণ আমার দিকে চোখ তুলে তাকালই না কোনওদিন। কাছেই যে এল না, তার আবার চলে যাওয়া! শুধু নোংরা আয়ান ঘোষটা এসে আমাকে ঘেঁটেঘুঁটে...

ঘড়ির দিকে তাকালাম,—'অফিস ফিরতে হবে না? আড্ডা মারলেই চলবে?'

তিনজন পা চালিয়ে ফিরছি। এখনও সি.টি.সি-র সামনে বসা বুড়োটা লাইটার সারিয়ে চলেছে। জীবনভোর বুঝি ঘসে ঘসে আগুনই জ্বালাতে চায়। কয়েকটা বাঙালি মেয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করতে করতে হাসিতে ফেটে পড়ল। একটা বাচ্চা ছেলে নীলহাট হাউসের গায়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাটা পেঁপে বিক্রি করছে। ওর পাশে আরেকজন শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে। চেনা চেনা যেন। আমরা কাছাকাছি যেতেই চোখ থেকে সানগ্লাস নামাল। কী ভীষণ শীতল দৃষ্টি। কিছু কিছু মানুষের চোখ এমন আততায়ীর মতো হয়। আমার গোটা শরীর শিরশির করছে। চিনেছি, চিনেছি। লোকটাকে নয়।

দৃষ্টিটাকে। ও চোখ অনিমেষের। ও চোখ আমাকে খুঁড়ে খুঁড়ে রক্তাক্ত করতে চায়।

রিসেপশন কাউন্টারে ঢুকে পড়েও হাঁপাচ্ছি। অনিমেষকে আর মনে করতে চাই না। তবু কেন ও হঠাৎ হঠাৎ এ রকম হিংস্র ছায়া ফেলে আমার ভেতরটায়। আমার ভয় করে। ভীষণ ভয় করে। চোখ ছাপিয়ে কান্না আসতে চায়। একটা শয়তান, লম্পট লোক...

সিনহা এসে যথারীতি দাঁড়িয়েছে সামনে।

—'ম্যাডাম, টিফিন করে ফিরলেন?'

মেজাজটা বিগড়ে গেছে। প্রায় খেঁকিয়েই উঠলাম,

—'আপনার কি মনে হয় নাচতে গিয়েছিলাম?'

লোকটা দাঁত বার করে হাসছে। অপমানও বোঝে না। নিজেকে সামলে নিলাম। এ লোকটার ওপর রাগ করা বোকামি।

—'আপনি আর কিছু বলবেন?'

—'না।' সিনহার চোখ অভ্যাসবশত আমার বুকের দিকে। তবে এ চোখে খিধেটুকুই সার। মুখের কাছে তুলে দিলেও এ চোখ কিছুতেই খেতে পারে না। কেমন যেন নির্জীব, প্রাণহীন। এরা বিপজ্জনক নয়।

—'আপনার একটা ফোন এসেছিল।'

—'কোত্থেকে?'

—'কী যেন, সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী না কী যেন নাম...আপনাকে রিংব্যাক করতে বলেছেন।'

—'ঠিক আছে।'

—'উনি কে হন আপনার? দাদা?'

—'না।'

—'বন্ধু বুঝি?'

—'আপনার জানাটা খুব দরকার?'

—'না...মানে...'

জার্মান স্পিৎজ-এর মতো ধমক খেয়ে লোকটা লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। আজকের মতো। হাসি পেয়ে গেল। কত রকম মানুষ আছে দুনিয়ায়। পড় না পড়, সিদ্ধার্থর ফোন এরই হাতে!

কিন্তু আমি এখন সিদ্ধার্থকে মোটেই ফোন করছি না। তার থেকে অনেক বেশি জরুরি কাজ জমে আছে হাতে। জি পি ও থেকে আসা চিঠিগুলো সর্ট আউট করে ফেলতে হবে বস লাঞ্চ থেকে ফেরার আগেই।

তিন

পৃথিবীতে যদি অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকে, তবে তার একটা নিশ্চয়ই সন্ধেবেলা আমার হোস্টেলের ছাদ। শান্ত অন্ধকারে হেলান দিয়ে আকাশ এখানে রাজ রাজেশ্বর। সূর্য ডুবে গেলে তখন তিনি সভায় আসেন। কোনওদিন গায়ে আলগা জড়ানো চাঁদনি মসলিন, কোনওদিন শুধুই সহস্র তারার পেশোয়াজ। অফিস থেকে ফিরলেই ওই আকাশরাজ ডাকে আমাকে। পায়ে পায়ে ওপরে উঠে আসি। এ সময় দোতলায় বারান্দা প্রায় নির্জন। অনেক বোর্ডারই দেরিতে ফেরে। বাকিরা হয় অফিসরুমে টিভির সামনে, নয় যে যার কুঠুরিতে। এ বাড়ির ঠিক পেছনে গাছ আর আগাছায় ভরা পোড়ো বাড়ি। ছাদে ওঠার সিঁড়ি থেকে বাউন্ডারিসুদ্ধ পুরো বাড়িটা দেখা যায়। ছমছমে অন্ধকারে ভাঙা প্রাসাদটা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এত বড় বাড়িতে কোনও জনপ্রাণী নেই। বিশাল বিশাল দরজা জানলাগুলো সবসময় বন্ধ। ইদানীং বন্ধ গেটের গায়ে দু-একটা ঠেলাওয়ালা রিকশাওয়ালা ডেরা বেঁধেছে। কলকাতার এ সব পুরনো অঞ্চলে এখনও এরকম কিছু প্রাসাদ পড়ে আছে, অযত্নে, অবহেলায়। হাইকোর্টে নাকি বহুকাল ধরে শরিকি মামলা চলছে। যে শহরে থাকার জায়গার এত অভাব সেখানে এত বড় একটা বাড়ি শূন্য পড়ে আছে ভাবা যায়! তা যতদিন থাকে থাক। ওদিক থেকে মাঝে

মাঝে ভারী মিষ্টি সব ফুলের গন্ধ আসে।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ওদিকে তাকালেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কৃষ্ণনগরের বাড়িতেও আমাদের একটা ছোট্ট বাগান ছিল। কতরকম যে ফুলের গাছ ছিল সেখানে। গন্ধরাজ, পারুল, হাসনুহানা। আমার বিয়ের সময় বাবাকে ওদিককার জমিটুকু বিক্রি করতে হয়েছে। হাজার দশেক নগদ দেওয়ার দরকার ছিল। আমাকে অবশ্য তখন সে কথা জানানো হয়নি। পরে জেনেছি। এখন ওখানে দাসবাবু লেদমেশিন বসিয়েছে।

একটা একটা করে করে সিড়ি ভেঙে ছাদে উঠছি। শরীরে আজ বড় ক্লান্তি। বেজায় খাটুনি যাচ্ছে অফিসে। ছ'শো টাকা মাইনের পুরোটা কড়ায় গণ্ডায় উশুল করে নেয় মালিকেরা। রিশেপশনিস্ট কাম টেলিফোন অপারেটর কাম টাইপিস্ট কাম ডেসপ্যাচ ক্লার্ক। তাও এ চাকরি বরাতজোরে জুটেছে। বরাত জোরে? নাকি দয়ার জোরে? মীরাদির সঙ্গে শালিনীর যদি পরিচয় না থাকত, কিংবা শালিনীর মার্গারেটের সঙ্গে, এ চাকরি আমি পেতাম না। মার্গারেট মেমসাহেবের এক কথায় মালহোত্রা সাহেব নিয়েছেন আমাকে। আরেকটাও অবশ্য 'না থাকত' আছে। সেটা আজকাল মনেই থাকে না। মীরাদিই অনেক কাছের মানুষ হয়ে গেছে যে। মীরাদির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আবার মেসোর মাধ্যমে।

ফাল্গুনের বাতাসে টিভির অ্যান্টেনাটা মৃদু দুলছে। এ সময়ে ছাদে বড় একটা কেউ আসে না। ফোলডিং মাদুর পেতে একলা শুয়ে থাকি। শুয়েই থাকি। যতক্ষণ না রাত বাড়ে, যতক্ষণ না নীচে থেকে খেতে যাওয়ার বেল বাজে। আকাশ ছাড়া আমাকে কেউ দেখতে পায় না। পাশের বাড়ির তিনতলা থেকে, যে আধবুড়ো লোকটা সবসময় উঁকিঝুঁকি দেয় এদিকে, সেও না। কোমর-সমান কার্নিশে চারদিক আড়াল। নাগরিক আলোর ঝাঁক ঝাঁক রশ্মিগুলোও সে আড়ালে থমকে যায়। কপাল জুড়ে লেপটে যাওয়া টিপের মতন নরম অন্ধকারে শুধুই তাদের আবছা আভাস। সেই আবছা আলোর পর্দা সরিয়ে বাদশাহি ভঙ্গিতে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আকাশ।

—'আজ কেমন আছ রাই?'

—'মহারাজ, সিদ্ধার্থকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

—'বিপদের কী আছে? তোমার কথা তুমি তাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও।'

—'আমি যে সেটাই পারি না সম্রাট। সিদ্ধার্থ তো ছেলে খারাপ নয়। এত বড় শহরটায় ওই আমার প্রথম বন্ধু। কেন যে হঠাৎ পাগলামিতে পেল ওকে?'

—'নিজের মনকে প্রশ্ন করে দেখেছ?'

—'দেখেছি। অনেকবার দেখেছি। ওকে আমি বন্ধু ছাড়া ভাবতেই পারি না। কেন এমন হল? কেন সিদ্ধার্থও আমাকে শুধুই বন্ধু বলে ভাবতে পারল না?'

—'হয়তো ওর কাছে তুমিই আলাদা আকর্ষণ...'

—'কচু, কচু। কী আছে আমার? কিস্যু নেই। একটা মফস্বলের ক্যাবলা আনস্মার্ট মেয়ে...'

—'না, ওটা আসলে মনভোলানো কথা। তুমি হচ্ছ সুবিধাবাদী। সিদ্ধার্থকে কিছু বলতে পার না কারণ সে মীরাদির ভাই। তুমি ভয় পাও তা হলে হয়তো তোমার কলকাতার মাটিটা...'

সত্যিই কি আমি তাই? স্বার্থপর? সুবিধাবাদী? ঠিক আছে, এরপর সিদ্ধার্থর সঙ্গে দেখা হলে খোলাখুলি কথা বলব। বলে দেব, ভাই, আমাকে মাপ করো। একবার যখন দড়ি ছিঁড়ে মুক্ত হতে পেরেছি, আর সে দড়ি গলায় বাঁধতে চাই না। সে তুমি যতই প্রেম নিয়ে আমার কাছে আসো না কেন।

ভাবছি বটে, সত্যি সত্যি দেখা হলে বলতে পারব তো? যা চাই না, তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার মতো মনের জোর আমার কোনওদিনই নেই। যা চাই, তাই বা মুখ ফুটে বলতে পারলাম কই! মনের কথাগুলো সব আমার মনেই রয়ে যায়।

ছাদের ঠিক মাঝখানে মাদুর পেতে আমি। গলির মোড়ে পাড়ার ছেলেরা যথারীতি গলাফাটানো আড্ডা জমিয়েছে। টুং টুং রিকশা ছুটছে এদিক-ওদিক। প্রপার কলকাতায় কোনও সাইকেল-রিকশার চল নেই। এখানে এখনও মানুষ মানুষকে টানে। পাড়া কাঁপিয়ে একটা লরঝরে টেম্পো লাফাতে লাফাতে চলে গেল ল্যান্সডাউনের দিকে। এ সময় সামনের রাস্তাটা দিয়ে প্রচুর গাড়িঘোড়া চলে। যদুবাজার থেকে পদ্মপুকুর যেতে এটাই সব থেকে শর্টকাট রুট কিনা। আমাদের হোস্টেলের দরজায়

ঢং ঢং বাজাচ্ছে চুরমুরওয়ালা। সব মিলিয়ে নীচে এখন কতরকম শব্দ। ওপর থেকে শোনাচ্ছে ঠিক কনসার্টের মতন। সমস্ত কোলাহল মিলে মিশে কেমন যেন ঝিমঝিম শব্দস্রোত ভাসছে বাতাসে। সেই শব্দ আর আলো পেরিয়ে আকাশ আবার কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—কী মেয়ে, এত মুখ শুকনো কেন?

—'ভাল লাগছে না। বড্ড টায়ার্ড।'

—'শুধুই টায়ার্ড? দাদার চিঠি পাওনি?'

—'পেয়েছি। এই তো ফিরেই পেলাম।'

—'মন খারাপ হয়ে গেছে তো?'

—'হুঁ।'

—'বাহ্, সেদিন কীরকম মেজাজটা দেখিয়ে চলে এলে। তোমার অভিমান হয়, ব্রতর হতে পারে না?'

—'তাই ওরকম সেন্টিমেন্টাল চিঠি লিখবে?'

—'তোমারও দোষ আছে।'

—'কী দোষ?'

—'নীলাঞ্জন আসবে শুনে পালিয়ে আসতে চাইলে, ভাল কথা...তা বলে বাড়ির সবার সঙ্গে ওরকম ব্যবহারটা করে এলে কেন?'

—'কেন করব না? কেন দাদা ওকে আমার সব খবর বলতে গিয়েছে? আমি কারুর করুণা চাই না। তা ছাড়া আমাদের ফ্যামিলির একটা প্রাইভেসি আছে। কেন দুনিয়ার লোক আমার কথা জানবে?'

—'দুনিয়ার সব লোক আর নীলাঞ্জন কি এক হল রাই?'

—'নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে ওর কীসের সম্পর্ক?'

—'নীলাঞ্জন ব্রতর বন্ধু। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

—'সেজন্য সব কথা ভ্যাক্‌ভ্যাক্ করে বলে দিতে হবে?'

—'আহা, এত রেগে যাচ্ছ কেন? ব্রতর আরও অনেক বন্ধু তোমার কথা জানে। সমীরণ, মুকুল...'

—'ওরা আমাকে নিজের বোনের মতো ভালবাসে। তা ছাড়া ওরা খুব ভাল।'

—'নীলাঞ্জন খারাপ?'

—'তাই বলছি নাকি? আমার কথা কেউ বুঝতে পারে না...'

—'খুব বুঝি রাই...'

—'দাদার মুখে শুনে সে নাকি খুব শক্‌ড্। কেন দাদারা অনিমেষকে এমনি এমনি ছেড়ে দিয়েছে...কেন উচিত ব্যবস্থা নেয়নি...'

—'হতেও তো পারে। তোমার শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কাহিনী শুনলে যে কোনও লোকেরই রাগ হয়, খারাপ লাগে...'

—'কী এসে গেল তাতে? বলছি তো, আমি কারুর সিমপ্যাথি চাই না। কারুর না। নীলাঞ্জনের তো নয়ই...'

—'অথচ তুমি তার কথাই ভাব। বিয়ের পরও তার জন্য মন কেমন করত তোমার। একা থাকলেই...'

—'করত, করত। তার জন্য তুমি আমাকে বাজে মেয়ে বলতে পারো। স্বামী ছাড়াও মনে মনে অন্য আরেকজনকে...'

—'পাগল মেয়ে। আমি কি তাই বলছি নাকি?' আকাশ হঠাৎ নরম হাওয়ার হাত বোলাল মাথায়,—'স্বামী যদি তোমার তেমন হত, কবেই তুমি নীলাঞ্জনকে ভুলে যেতে, যেতেই। কোথাও কোনও ফাঁক না থাকলে মন কখনও অন্যদিকে যায় না।'

—'আমার ভীষণ ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

—'এই শনিবার তবে চলে যাও। ও তো এখন বদলি হয়ে কৃষ্ণনগরেই ফিরে এসেছে।'

—'হুঁ। কতদিন যে ওকে দেখিনি...'

—'তবে এবার ব্রতকে সব খুলে বোলো। কখনও যা বলতে পারোনি...'

—'না। যাব না। আমার কান্না পাচ্ছে। যে আমার দিকে কোনওদিন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত, জানল না আমার মনের কথা, তার কাছে ভিখিরির মতো...'

আকাশ বুঝি চোখ বুজল। পাতলা সরের মতো কোথা থেকে এক ফালি মেঘ এসে হাজির। ডান দিকের হলুদ তারাটা কুট্ করে শরীর মটকাল। কোনও তারাকে টিপটিপ করতে দেখলেই ছোটবেলায় বন্ধুরা একে অন্যের চোখ চেপে ধরত,—'বল, বল, বল, তোর আমার ক' চোখ?'

—'চার চোখ।'

—'আবার বল।'

—'চার চোখ বাবা, চার চোখ।'

আমাদের ক্লাসের নূপুর খুব দুষ্টু ছিল। কখনও ঠিক উত্তর দিত না। ছোটদের কতরকম মজার মজার সব সংস্কার থাকে। চুলে যদি চুল জড়াল, অমনি তবে দোষ কাটাও। বলো, 'চুল? না ফুল?'

নূপুর বলত,—'চুল।'

—'এই না, হবে না। ঠিক উত্তর দাও। বলো ফুল।'

—'কেন চুলকে ফুল বলব? বলব না।'

—'ভীষণ অসভ্য তুই।'

এভাবেই ঝগড়া করতে করতে নূপুরের সঙ্গে পুরো দু মাস আড়ি। তারপর যেই ভাব, অমনি ডাব ডাব ডাব। শৈশবের দিনগুলো কী যে নির্মল থাকে!

—'তুমি সেই ছোট্ট মেয়েটাকে জানতে আকাশ? সেই যে গো, কথায় কথায় যার ঠোঁট ফুলে কমলার কোয়া আর চোখ টিপলেই পাতি লেবুর জল! জানুয়ারির এক কনকনে ভোরে সে সেজেগুজে তৈরি। প্রথম দিন স্কুলে যাবে। কাছেই একটা নার্সারিতে। তবু মায়ের দুশ্চিন্তা কত। যদি মেয়ে হারিয়ে যায় অনেক মেয়ের মধ্যে? বড় কাগজে গোটা অক্ষরে নাম ঠিকানা লিখে, সেফটিপিন দিয়ে সেঁটে দিল মেয়ের বুকে—রাইকিশোরী চৌধুরী, ষষ্ঠীতলা, কৃষ্ণনগর। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে অবধি মেয়ের কী উৎসাহ। তারপর যেই না এসেছে সিঁড়ির কাছে, অমনি বুক ভর্তি দুকদুক শব্দ, পাখির ছানা প্রথম আকাশে উড়তে যেমন ভয় পায়।...আমি যাব না। কোথথাও যাব না। কাঁদতে কাঁদতে তুলতুলে নীল পাখির বাচ্চাটার গাল ভর্তি কাজল। লাল রিবনের ফুল গোলাপের মতো ফুটে আছে এইটুকুন দুই বিনুনিতে।...কাঁদছিস কেন বোকা মেয়ে? একটু পরেই তো বাড়ি চলে আসবি। স্কুল ছুটি হলেই...মেয়ে তবু কাঁদে আর কাঁদে। বাবা কোলে তুলে নিয়ে চলল পৌঁছে দিতে। এভাবেই তো বাবা মায়েরা একটু একটু করে পথ চিনতে শেখায়।...চল, স্কুলে দেখবি কত বন্ধু, কত খেলনা। ভিতু পাখিটা তবু ছিটকে ছিটকে যায় কোল থেকে। ধুলোটুলো মেখে একশা।...ছি মা, এরকম করে না। স্কুলে না গেলে বড় হবে কী করে? মার মতন? শুনে মেয়ে গুটিশুটি ওঠে। ফের কাঁদতে বসে পা ছড়িয়ে। এভাবেই আশায়, কল্পনায়, ভয়ে, শঙ্কায় রাইকিশোরী শেষে পৌঁছে গেল স্কুলে। তার প্রথম বাইরের জগৎ। তারপর ধাপে ধাপে হাইস্কুল...কলেজ...শ্বশুরবাড়ি...তারপর মহাসাগরের মতন এই বিশাল আরেকটা...। জানো আকাশ মহারাজ, চোখ বুজলেই আমি ছেলেবেলার সব কথা মনে করতে পারি। একেবারে ডিটেলসে...'

—'সবাই পারে।' আকাশ হাসছে ঝিকঝিক,...'জীবনের সবথেকে সুন্দর আর নিশ্চিন্ত দিন যে ওগুলোই।'

—'তারপর কীভাবে হঠাৎ একদিন বড় হয়ে গেলাম...'

—'হুঁ, মেয়েদের বড় হওয়াটা ফুল ফোটার মতো। সবুজ কুঁড়ি ক্রমশ পরিপূর্ণ হতে হতে, চাঁদের কলার মতন, একদিন সব পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়। কী মধুর অথচ তীব্র ঘ্রাণ তখন তাদের শরীরে, মনে...'

—'বাজে কাব্য কোরো না তো। মেয়েদের বড় হওয়াটা খুব যন্ত্রণার, খুবই যন্ত্রণার। বিশ্রী কটকটে ব্যথার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ একদিন বড় হওয়া আসে। প্রথম বার আমি কী ভয়ানক ভয় পেয়েছিলাম!...মা, কেন এমন হল?...দূর কাঁদছিস কেন বোকা মেয়ে? সব মেয়েরই হয়। আজ থেকে তুই বড় হয়ে গেলি। চন্দনা বলত, মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই অভিশাপ। আগের জন্মে অনেক পাপ করলে...শরীর জুড়ে

একশো জটিলতা। কতরকম ভয়। এ ছাড়াও আছে হাজার শাসন, অনুশাসন সেই বুড়ি হয়ে না মরে যাওয়া পর্যন্ত। আর পুরুষের ছড়ি ঘোরানো লাল চোখ...বিশ্রী।'

—'তুমি ঠিক বলছ না রাই। নারীজীবনে শুধুই কি দুঃখ? আনন্দ নেই? রোমাঞ্চ? কিশোরী বয়সটাকে মনে করো...'

—'হ্যাঁ ওই বয়সটাই তো শুধু স্বপ্ন দেখার। ঠিক, ঠিক। তখনই তো নীলাঞ্জনকে প্রথম...আসলে ওই চন্দনাটা...নিজে প্রেম করছিল কিনা, সমীরণদার সঙ্গে, তাই আমাকেও খেপাত। নীলাঞ্জনকে দেখলেই খালি চোখ টিপত আমাকে...'

—'তোমারও ভাল লাগত। লাগত না?'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কী রোমাঞ্চ ছিল ওকে লুকিয়ে দেখায়। নীলাঞ্জন সত্যিই সুন্দর। ঠিক স্বপ্নের প্রেমিক যেমন।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর কী? ও তখন কলেজে, আমি স্কুলে। তারপর দ্যাখ না দ্যাখ, ও ইউনিভারসিটি, আমি কলেজ...'

—'আর?'

—'আর কী? কিছুই না। বড় লাজুক দাদার ওই ভাল ছেলে বন্ধুটা। কোনওদিন চোখ তুলে ভালভাবে কথাই বলল না আমার সঙ্গে। আমিই শুধু মরে রইলাম। প্রথম যৌবনের আবেগ বড় কষ্ট দেয় গো। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে শুনতে চোরা চোখে শুধু দেখি আর দেখি। দাদাকে ডাকতে এলে দেখি। রাস্তায় দেখি। ক্রিকেট মাঠে ছুটে দেখে আসি ওকে। ওর কত কত গুণ। লেখাপড়ায় সেরা, স্পোর্টসে ইউভারসিটির ব্লু। আমি সে তুলনায় নিতান্তই সাধারণ। হায়ার সেকেন্ডারি সেকেন্ড ডিভিসন, পাসে বি এ...

—'ভালবাসার সঙ্গে এ সবের কোনও সম্পর্ক নেই।

—'জানি। তবুও...আসলে ওর চোখদুটো...নিয়তির মতো আকর্ষণ যেন ওর চোখে...'

—'এতই যদি, কেন প্রকাশ করনি নিজেকে? ব্রতকেও তো বলতে পারতে...'

—'হায় রে, সত্যি যদি পারতাম! বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পরও ছুটে গেছি ওদের বাড়িতে। বোকার মতন। কেন যে গিয়েছিলাম? মাসিমা আমাকে দেখে অবাক স্বাভাবিকভাবেই...কী হয়েছে রে রাই? হাঁপাচ্ছিস কেন?

—'আমার তখন যা রাগ হচ্ছে নিজের ওপর কথা খুঁজে পাচ্ছি না যে,...দাদা এসেছে?'

—'না তো। কিছু হয়েছে নাকি তোদের বাড়িতে? তোর মুখচোখ এমন কেন? ভাগ্যিস নীলাঞ্জন তখন বাড়ি ছিল না! ভাগ্যিস মাসিমা কখনও জানতে পারেননি দাদা তখন বাড়িতেই। একটু আগে ফিরেছে শিবপুর থেকে। বাবা আর দাদা। পাকা কথা বলে।'

—'তারপর অনিমেষ।'

—'হ্যাঁ, অনিমেষ। রাইকিশোরীর দুঃস্বপ্ন। রাইকিশোরীর জ্বালা।'

—'আর?'

—'আর রাইকিশোরীর প্রথম পুরুষ। স্বামী, প্রভু...'

—'আর?'

—'আর ঘৃণা।'

—'কেন অমন হল রাই? নীলাঞ্জনের জন্যই কি...'

—'কখ্খনো না। নীলাঞ্জনকে তখন ভুলতেই চেয়েছিলাম। বারবার মনকে বুঝিয়ে...'

—'মন বুঝেছিল?'

—'না বুঝলে বিয়ের দুদিন আগে রাতভোর অচেনা মানুষটাকে স্বপ্ন দেখব কেন? কত কী নতুন নতুন কল্পনা...চন্দনা বলেছিল, তোর বরের ছবিটা কিন্তু বেশ। একটু মোটাসোটা, মন্দ নয় তবু...অনিমেষ তো সুপুরুষই, সুদর্শন, বিরাট ব্যবসার মালিক। আমার আর কীসের অভাব?...ফুলের রথে করে সে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে যাওয়ার আগে সে কী কান্না, শরীর নিংড়ে, বুক নিংড়ে।

এতদিনের পরিচিত মানুষজন, আপনলোকেরা সব পর হয়ে গেল। দুদিনের মাত্র অনুষ্ঠানে মেয়েরা কোথা থেকে যে কোথায় চলে যায়! সেফটিপিনে সাঁটা ঠিকানাটা বদলে গেল হঠাৎ, শুধুই কটা মন্ত্রের জোরে। আজ থেকে আমি আর কেউ নই কৃষ্ণনগরের। যত ভাবছি চোখ ফেটে জল, জল। চিরকালের মতো কিছু ফেলে যাওয়া যে কী কষ্টের! ছোট মাসি বারবার গালে তুলি টানে,...এই মেয়ে, আর একদম কাঁদবি না বলে দিলাম। তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাদের নিন্দে করবে। বলবে, মেয়েটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়েও পাঠায়নি।...বলেছিল নাকি সত্যি সত্যি? ওরা কেউ? শাশুড়ি? দুর্গাপুরের ননদ?'

—'ওরা কিন্তু সবাই বলেছিল খাসা বউ হয়েছে।'

—'অস্বীকার করছি নাকি? বলেছিলই তো। পাড়াপ্রতিবেশী, জ্ঞাতিগুষ্টি। নতুন বউ বাড়িতে এলে ওই বাক্যটা সবাই বলে, সামনাসামনি। বলতে হয়।'

—'এটা তোমার রাগের কথা।'

—'না গো না। রাগ নয় গো, অভিমান। যার মুখ থেকে প্রথম ভালবাসার কথা শুনতে চাইলাম...মনে মনে যাকে বারবার বলেছি, নাও আমাকে, নাও, সেই লোকটা...'

—'কী সেই লোকটা...'

—'ভাল্লাগছে না ভাবতে!'

—'তবু?'

—'তবু আর কী? একটা-দুটো কথা ফুলশয্যার খাটে, যেমন—মার সেবা কোরো, কাজকর্ম সব বুঝে নিয়ো...মাঝে মাঝে আমি পার্টি দিই, ব্যবসার খাতিরে। ড্রিংক করতে হয়...আপত্তি নেই তো?—না, আপত্তি কীসের?...তোমাকে যেতে হবে সঙ্গে...বোঝই তো ব্যবসার ব্যাপার...ব্যস, আলো নিভে গেল। টিউবটা। নাইট বালব জ্বলছে। এই আলোতে প্রথম পুরুষ খুঁড়ছে আমাকে...খুঁড়ছে, খুঁড়ছে, শুধুই খুঁড়ছে...মন নয়, শরীর চাই। শরীর দাও...এই তো দিলাম। নাও, যেভাবে তোমার খুশি। তবে প্রথম রাতেই সব খুলে নিও না, দোহাই। কিছু থাকুক। কিছু লজ্জা, কিছু আবেশ—ভাললাগার।—না, আমি দেখব। আজই সব...মনটা দেখবে না?...প্লিজ, শোনো, ও সব ভাষায় নয়, অন্য ভাষা বলো...সবসময় শুধুই?...ওই দ্যাখো, তোমার মা ডাকছে। এ সময় কোনও মা ছেলের ঘরের কড়া নাড়ে?'

—'তবে এই তোমার বিয়ের কথা?'

—'কথা নয়। অভিজ্ঞতা। প্রথম দিন থেকেই।'

—'ভালবাসা তা হলে আসেনি কোনওদিন?'

—'হয়তো এসেছিল। হয়তো আসেনি। বোঝার সময় এল কই? আসলে যদি ওদের বাধ্য থাকতাম সব অন্যায় মেনে নিয়ে, কিছুই হত না, এরকম। ওদের একটা চেনে বাঁধা কুকুরের দরকার ছিল। বউ নয়। কত বলব? বলে বলে শেষ হয় না। ছ মাসেই তখন ছ হাজার বছর কাটিয়ে ফেলেছি, দুঃখে, হতাশায়।'

—'মূল সমস্যাটা ঠিক কী ছিল?'

—'একটা কি আর। লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার। শাশুড়ি বলে, তোমার বাবা এই দেয়নি, ওই দেয়নি।—স্বামী বলে, রঙ্গনাথনের পার্টিতে একটু ড্রিংক করলে কী ক্ষতি হত? জানো রিফিউজ করা অভদ্রতা।...শাশুড়ি বলে, ঘন ঘন অত বাপের বাড়ি যেতে চাও কেন? এ বাড়িতে যখন এসেছ...। স্বামী বলে, তুমি বড় ন্যাকা। চ্যাটার্জির পাশে কিছুক্ষণ বসলে সতীত্ব নষ্ট হত? অত বড় অর্ডারটা... শাশুড়ি বলে,...কত বলব? শেষ হবে না যে। বেড়েই যাবে। রবারের মতন।'

—'তারপর সেই রাতটা এল...'

—'হ্যাঁ, শয়তানের রাত। একটু একটু করে গভীর খাদের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছি আমি...কী অপমান, কী লজ্জা...তাও সব সহ্য করেছি বাবা মার কথা ভেবে...মারধোর, গালাগালি...সেদিন আর পারছি না। কাকে যে একটু মনের কথা বলি। কেউ নেই। বাবা মা কত কষ্টে ধার দেনা করে বিয়ে দিয়েছে। তাদের বলা যায় না। দাদা ভাইয়াকেও না। ওদের আমি বড় আদরের বোন। কাউকে বলতে পারছি না। শাশুড়ি চিৎকার করছে, কী অবাধ্য বউ দেখেশুনে ঘরে আনলাম! স্বামীর হুকুমে আমরা মুখে জুতো বইতাম...স্বামী বলল, বাইরে লোকের সামনে মুখের ওপর আমাকে তুমি না বললে? এত তেজ?—

তুমি আমাকে অপমান করছ। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে...আমি মানুষ নই? যেভাবে খুশি ব্যবহার করবে?—ঠিক আছে। কালই তুমি চলে যাবে কৃষ্ণনগরে। তোমাকে আমার দরকার নেই।—যাব না। এখানেই থাকব। তোমাকে শোধরাতে হবে নিজেকে। এটা এখন আমারও ঘরবাড়ি...কীসের ঘরবাড়ি? কীসের ঠিকানা? মেয়েদের কোনওদিন কোনও ঠিকানাই থাকে না। কারুরই কি থাকে?'

—'কেঁদো না রাই। চোখ মোছো।'

—'তুমিই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছ। এক বুক আশা নিয়ে যাওয়া আর এক সমুদ্র হতাশায় ফেরা...আমি কি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেদিন। নাকি সত্যি ওরা খাইয়ে দিয়েছিল কিছু? মনে নেই। কিছু মনে নেই। সব ব্ল্যাঙ্ক তখন, মহাশূন্যের মতো। আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছি, নীচে আরও নীচে। এই জন্যই কি মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম? এই পরিণতির জন্য? নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কে বুঝি ফুসফুস দুটো নিংড়ে নিল, প্রকাণ্ড থাবায় চেপে ধরল হৃৎপিণ্ড। কে যেন বলল, মরে যাও তুমি।...হাসপাতালে পুলিশ অফিসারটা জেরা করেছিল খুব.. কে সেদিন আপনাকে কতগুলো ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল?—কেউ না।...নিজে নিজেই খেয়েছিলেন? হ্যাঁ।—কে খেতে বলেছিল আপনাকে?...কেউ না।...জানেন, আত্মহত্যা করা আইনত অপরাধ?—জানি।—কেন মিথ্যে কথা বলছেন? কাদের বাঁচাতে চাইছেন? ওরা আপনাকে মানুষ বলে গণ্য করত না। অত্যাচার করত আপনার ওপর। অত্যন্ত নীচ।—কী করে জানলেন? কাউকে তো বলিনি! লোক বলেছে?...হতে পারে।...এতদিন তা হলে তারা প্রতিবাদ করেনি কেন? শেষ মজাটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল? না, ইন্সপেক্টর, আমি নিজেই খেয়েছিলাম অতগুলো...কী খেয়েছিলাম? জানি না। বাঁচতে আর ভাল লাগছিল না যে...'

—'বাপের বাড়িতে অন্তত সত্যি কথাটা বলতে পারতে রাই।'

—'কী লাভ বলে?'

—'তা হলে এখন বলো। আমাকে। কেউ শুনতে পাবে না...'

—'আমার কিছু মনে পড়ছে না। বিশ্বাস করো আকাশ, আমার ঘুম পাচ্ছে। অবশ হয়ে আসছে শরীর...'

—'রাই, ওঠো। উঠে বোসো। লক্ষ্মী মেয়ে। নইলে আবার আগের মতো তোমার...'

—'আমাকে ঘুমোতে দাও আকাশ, প্লিজ। ঘুম পাচ্ছে আমার। বড্ড ঘুম...ঘুম—ঘুম—ঘু উ উ উ ম—'

চার

কিছু মিশ্র শব্দে হোঁচট খেতে খেতে এভাবেই ঘুম ভাঙে প্রতিদিন। দোতলার বাথরুমে কাপড় আছড়ানোর আওয়াজের সঙ্গে একতলার রেডিয়োতে কান ফাটানো গান। ঝনঝনে, সুবেলা হাসির সঙ্গে তারে শাড়ি মেলা নিয়ে দুই পরিচিত কণ্ঠস্বরের চিল-চিৎকার, ঝাড়ুদারের ঝাঁটাঝংকার। ঘুম ভাঙার পরও চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে থাকি কিছুক্ষণ। উঠে লাভ নেই। ওপরেব বাথরুম খালি পাব না। দরকার তেমন হলে নীচে ঘুরে আসি। তারপর চা খেয়ে শুয়ে থাকা। সাড়ে সাতটার আগে আমার স্নানে যাওয়ার সুযোগ নেই।

আপনি কখনও মেয়েদের হোস্টেলের ভেতরটা দেখেছেন কোনওদিন? একদম ভেতরটা, যাকে বলে অন্দর মহল? যদি না দেখে থাকেন তবে রহস্যময় এক বিচিত্র নারীজগৎ আপনার অজানাই থেকে গেল। হিংসায়, প্রেমে, স্নেহে, স্বার্থপরতায়, ক্রুরতায় ভরা এ এক বর্ণময় পৃথিবী। আমি এখন শুয়েই এ বাড়ির কোথায় কী হচ্ছে তার একটা ছবি আপনাকে দিয়ে দিতে পারি। নীচের ঘুপচি ডাইনিং স্পেসে একটা ষাট পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলে সর্বসময়। এখনও জ্বলছে। সেখানে টানা লম্বা টেবিলে প্রকাণ্ড কেটলি হাতে দাঁড়িয়ে কার্তিক। কেটলি ঘিরে বোর্ডারদের গ্লাস, কাপ। পেছনের রান্নাঘরে জয়রামের মশলা বাটার শব্দ, ঠাকুরের হাতা খুনতি নাড়ানাড়ি। এক নম্বর ঘরের ব্রততী এসময়ে যোগ ব্যায়ামে ব্যস্ত। ব্রততী লেস্‌বিয়ান। সাত অক্ষরের এই ইংরাজি শব্দটিও আমার কলকাতায় এসে শেখা। ব্রততীর দু-তিন জন অনুরক্তাও আছে। তারাও এখন ওর সঙ্গে ধনুরাসন, ময়ূরাসন করে চলেছে। দু নম্বরের

বউদির জলখাবার তৈরি হয়ে এল বোধ হয়। এখনই স্টোভ নেভাবে। এখানে অনেকেই ঘরে টুকটাক খাবার বানায়। সকালে রোজ বউদি কার জন্য অত যত্নে টিফিন কেরিয়ার গোছায় কে জানে! মিস্টার মুখার্জির জন্য কি? এখ্খুনি ভদ্রলোকের চকোলেট মারুতি বাইরে পিপ্ পিপ্ করবে। ওই তো শব্দ হচ্ছে বোধ হয়। বউদি নিশ্চয়ই ছুটছে হুড়মুড় করে। অফিস ঘরের পার্টিশনের ওপার থেকে সুপারদিদি বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পরনে রংজ্বলা সবুজ ছোপ ছোপ হাউস কোট। আহা, পিসিমা পিসিমা চেহারার এই বেঢপ থলথলে মহিলার অঙ্গে মেমসাহেবি পোশাকখানা কী অপরূপ যে লাগে! সকালের প্রথম রোদে শরীর ডুবিয়ে নিশ্চয়ই মিস্টার মুখার্জি গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। গর্বিত মোরগের মতো ঋজু ভঙ্গি। বড়দির সঙ্গে তার একটা-দুটো কথা হবে, সঙ্গে কিছু বিগলিত হাসি বিনিময়। তারপরেই হুশ করে উড়ে যাবে বউদিকে নিয়ে। ডেপুটি সুপার ছোড়দি স্নানটান সেরে এতক্ষণে রান্নাঘরে। অন্তত ঘণ্টাখানেক ঠাকুরের পেছনে খিচখিচ করবে। যত হাত মুখ নাড়ে কানের ঝোলা দুলজোড়া টিকটিক দোলে। পঁয়তাল্লিশ বছরের ছোড়দি পঞ্চান্নর বড়দির তদ্‌গত প্রেমিকা। হাবভাব, পোশাক-আশাকে মহিলা কিছুতেই তিরিশ পার হতে রাজি নন।

ওফ, পারা যায় না। কাকটা কী বিশ্রী চেঁচাচ্ছে দেখুন। ডানদিকে জানলার ধারে জারুল গাছটায় কদিন হল বাসা বেঁধেছে। কেউ কি ওর ছানাপোনাকে আক্রমণ করল নাকি? কই না, বাসাটা তো দিব্যি ফাঁকা। অকারণে এমন চেঁচাচ্ছে যেন তিন নম্বরের বুলবুল। মেয়েটা ঠিক এরকম ক্যাক ক্যাক করে সবসময়, নয় কানে ওয়াকম্যান্ লাগিয়ে মাইকেল জ্যাকসন শোনে। আর কোমর দোলায়। ওদের ঘরের শর্বরী আবার বাংলা আধুনিক গানের ভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই ঢুলুঢুলু চোখে টেপ বাজতে শুরু করে...ওগো তুমি যে আমার...ওগো তুমি মম প্রাণ গো...ওগো তোমার বিহনে। সামনের বৈশাখে ওর বিয়ে।

একতলার ঘরগুলোর তুলনায় ওপরকার ঘরগুলো আপাতভাবে শান্ত। এ বাড়ির নীচেটা যদি হয় উদ্দাম স্রোত, তো দোতলা চোরা ঘূর্ণি। ওপরের বাথরুম যথারীতি বহুক্ষণ বন্দনাদির দখলে। মন্দিরাদি মাঝে মধ্যে ধাক্কা দিয়ে আসছে বন্ধ দরজায়। অনেকদিন ধরে দুজনের কথা বন্ধ। চৌকির পাশে আধবালতি জল আর বিছানায় ঢাউস আয়না বসিয়ে সাজগোজ শুরু হয়ে গেছে এ ঘরের শুভ্রার। মুখের মেক আপ শেষ হতে কিছু না হোক পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপর চুল সেটিং-এর পালা। রাতে ঘুমোনোর আগেই ডজনখানেক কার্লারে গোল্লা গোল্লা করে চুল পাকিয়ে রাখে। মাথায় ওরকম ধড়াচুড়ো পরে কী করে যে ঘুমোয়! ক্লিপগুলো খোলার পর খুব সাবধানে সামনে পেছনে মোটা ব্রাশ টানে। স্টেপ কাট চুল থাক থাক ঢেউ হয়ে ফুলে ওঠে তখন। কিছুদিন হল গোটা গায়ে মুখে ওয়্যাক্সিং করিয়েছে। ক্রিশ্চিনও মাঝে মাঝে করে, দিব্যি মাখন মাখন ভাব আসে চামড়ায়। ও সব করতে নাকি দারুণ কষ্ট হয়। আচ্ছা বলুন তো, অযথা নিজেকে যন্ত্রণা দিয়ে সুন্দরী হওয়া কেন? শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনওদিনই শুভ্রা সকালে স্নান করে না। বালতি থেকে আঁজলা জল তুলে থুপ থুপ থুপে নেয় ঘাড়ে, মুখে গলায়, হাতে, বুকের খাঁজে। তার ওপরে হালকা করে সাবান বোলায়। শেষে ঠিক দাড়ি কামানোর কায়দায় আস্তে আস্তে চেঁছে নেয় জলসাবান। শুভ্রা যখন সাজতে বসে ঠিক তখনই পাশের ঘরে মঞ্জুদির পুজো শুরু হয়। মাটিতে তো জায়গা নেই, তাই চৌকির ওপরই কম্বলের আসন বিছোনো। তার আগে অবশ্য গোটা বিছানায় গঙ্গাজলের ছিটে দেয়। হরলিক্স-এর বোতলে ভরা গঙ্গাজল ভারী যত্নে রাখা থাকে চৌকির নীচে। দেওয়ালে গাঁথা কাঠের র‍্যাকে জনা দশ-বারো ছোট্ট ছোট্ট দেবতার বাস। পুজো মনে হয় শেষের মুখে। ও ঘর থেকে জোর ঘণ্টা নাড়ার শব্দ আসছে। ওই টানা টিং টিং শব্দের ভেতর বসে কী করে যে কাঁকন নাটকের পার্ট মুখস্থ করে যায়!

এ ছাড়া উপায়ই বা কী? একেক ঘরে বোর্ডার পিছু বরাদ্দ তিরিশ বর্গফুটের মতো জায়গা। তার মধ্যেই চৌকি, বিছানা, ট্রাঙ্ক, বাক্স, বাসন-কোসন নিয়ে প্রত্যেকের আলাদা ঘর-সংসার। মেয়েরা বোধ হয় এক বিঘত জায়গা পেলেও সেখানে সংসার পেতে ফেলতে পারে। ছেলেবেলায় আমরা ঠিক এভাবেই বারান্দায় টুকরো টুকরো পুতুলের ঘরবাড়ি বানাতাম। কোনওটা আমার সংসার। তো কোনওটা চন্দনার, কোনওটা ছোটবুড়ির। ববারের ছেলেমেয়েরা ভাগাভাগি হয়ে একেক দল একেক সংসারে। এখানে সেই পুতুলগুলোরই যা অভাব। সব ঘরেই এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত টানা লম্বা লম্বা

প্লাস্টিক দড়ি। নিজস্ব এলাকার দড়িটুকু দিনে আলনা, রাতে মশারি টাঙানোর খুঁটি। আলাদা আলাদা র‍্যাকগুলো যেন এক একটা ভিন্ন রুচির পৃথিবী।

এইটুকুনি জায়গা পাওয়ার জন্যই যা ছোটাছুটি করতে হয়েছিল। দাদা আর মেসো রাতদিন খুঁজে বেড়ায়। সেই টালা থেকে টালিগঞ্জ। কলকাতায় সরকারি হোস্টেলের সংখ্যা খুব কম। মানে লেডিজ হোস্টেলের। যাও আছে তাতে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। ভাগ্যিস এরকম কিছু প্রাইভেট আছে, তাই বাঁচোয়া। প্রাইভেট হোস্টেলগুলোও সব কানায় কানায় ভর্তি। একটা সিটের জন্য কুড়িজন আসছে। আমাদের এই 'শান্তি-নীড়ে'র বেনামি মালিক যে বুড়ো ভামের মতো উকিলটা, তার জুনিয়র মেসোর বন্ধু। তাকেই ধরে শেষে...। বুড়ো রোজ সন্ধের পর অফিসে এসে বসে। বড়দি ছোড়দি দুজনেই খুব সাজগোজ করে থাকে তখন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কত গুজগুজ, ফিসফাস। সে যাই করুক, আমি আদার ব্যাপারি...। বুড়োর কৃপায় আস্তানাটা তো পেয়েছি। আস্তানা বলুন আস্তানা, আশ্রয় বলুন আশ্রয়।

ছোট মাসি বারবার বলেছিল,—'আমরা থাকতে, কেন রাই হোস্টেলে থাকবে? ও আমাদের কাছে থাক। আমার সঙ্গে থাকলে মনটাও ভাল থাকবে। তা ছাড়া ওর মেসোর গাড়িতে অফিস যাতায়াতও করতে পারবে।'

মারও তাই ইচ্ছে। আসলে তখন আমাকে একলা ছেড়ে দিতেই মার ভয়। আবার যদি মেয়ের কিছু হয়ে যায়। বাবার তো একদমই ইচ্ছে ছিল না আমি চাকরি বাকরি করি। কলকাতায় গিয়ে তো নয়ই;—কী দরকার। রাই তো জলে পড়ে নেই। ঈশ্বরের কৃপায় মেয়ে যখন ফিরে পেয়েছি তখন আমাদের কাছেই থাক। পড়াশুনো করুক। গানবাজনা করুক। আমাদের চাট্টি জুটলে ওরও জুটে যাবে।'

দাদা প্রবল আপত্তি জানাল,—'না রাই এখন মোটেই ঘরে বসে থাকবে না। আমার মতো চাকরি বাকরি করতে হবে ওকে।'

মা বলল,—'সেটা কৃষ্ণনগরেই চেষ্টা করে দেখুক না। কলকাতায় কেন?'

—'কলকাতায় যখন একটা পাওয়া গেছে, তখন সেখানেই যাক।'

ছোট মাসি বলল,—'তা বেশ। কিন্তু আমার ওখানে থাকতে আপত্তি কীসের?'

—'না। রাই একাই থাকবে।' ছোট মেসোও সায় দিয়েছিল দাদার কথায়।

আসলে দাদারা চাইছিল আমার নিজের ওপর কনফিডেন্স আসুক। সবসময় ধাক্কা দিচ্ছে,—'শক্ত হ রাই। তোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। কারুর ওপর ভরসা না করে—।'

শব্দগুলো শুনতে শুনতে একটা শীতল আতঙ্ক ঢুকে পড়ত আমার ভেতরে। এই গোটা পৃথিবীর সামনে আমি একা? আমি? রাইকিশোরী? সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জগতে আমি হাঁটছি, ঘুরছি, হাসছি—একা? অফিসে চেয়ার টেবিলের সামনে বসে আমি! একরাশ অদেখা মানুষের দৃষ্টির সামনে আমি! শহরের ভিড়ের মাঝে আমি! জানতামও না সেই ভিড় কেমন হয়। মানুষের? না, বাঘভাল্লুকের? কোনওদিন তো সেরকম ভাবে বাড়ির বাইরে বেরোইনি। বিয়ের আগে ঘাড় নিচু করে কলেজে গিয়েছি, এসেছি। সেও তো দল বেঁধে। সেখানেও আমি 'আমি' নই। একটা সমষ্টির অংশমাত্র। সেখানে আমার দ্বিধা, বিস্ময়, ভয়, রোমাঞ্চ, আনন্দ সবই সেই সমষ্টির টুকরো শুধু। আমারও যে একটা আলাদা অস্তিত্ব থাকতে পারে—একদম স্বতন্ত্র—আমি যে আমিই—রাইকিশোরী—এ কথা তো কোনওদিন ভেবে দেখিনি। ভাবতেই শিখিনি। এখন কী মনে হয় জানেন? সে ছিল এক পরজীবী উদ্ভিদের জীবন। শক্ত গাছের মতো দাঁড়িয়ে আমার বাবা, মা, দাদা। সেই গাছের গুঁড়িকে জড়িয়ে একটু একটু করে বেড়ে উঠেছি আমি। তবে পরগাছাতে কি ফুল আসে না? বন্দাক অর্কিডও ফুলে প্লাবিত হয়। তাই হয়তো প্রেম। তাই নীলাঞ্জনের মতো কেউ—থাক ও সব কথা। সে ভারী গভীর গোপন। আমার নিজস্ব। তারপর শিবপুর। এক গুঁড়ি ছেড়ে আরেক গুঁড়িকে আঁকড়ে ধরা। মেয়েদের জীবনটাই তো এরকম। নতুন গাছটার সঙ্গে মানিয়ে গেল তো ভালই। নইলে প্রাণরসের অভাবে পরভুক লতা শুকিয়ে কালো। তখন কি আর তাতে ফুল ফোটে?

ওই যে, মঞ্জুদিকেই দেখুন না। বিয়ের সময় এক বাক্যে সবাই বলেছিল, মঞ্জুর কী কপাল। কত বড় বংশে বিয়ে হল। সুন্দর স্বামী। বিরাট চাকরি করে। কে স্বপ্নে ভেবেছিল মঞ্জুদির নতুন গাছটাই ফোঁপরা? পতিদেবতা রাতের পর রাত পড়ে থাকে ট্রেনলাইনের ধারে বস্তিতে। সঙ্গে দেশি মদ। ধেনো না চুল্লু কী

যেন বলে? মঞ্জুদি একদিন বলছিল—'ওদের বংশে এটা এমন কিছু নতুন নয় রে রাই। ওনার বাবা যেতেন, ঠাকুরদা যেতেন। তবে কী? না, তারা যেতেন যেমন, ফিরেও আসতেন। শুধু শ্বশুরমশাই মায়ায় পড়ে বাঁধা মেয়েমানুষের জন্য ঘর তুলে দিয়েছিলেন। আমার উনিও যদি সেরকম কিছু করতেন—কী যে মাথায় ঢুকল ওঁর।' বুঝুন অবস্থা। বাড়ির বাইরে বাঁধা মেয়েমানুষ থাকলে আপত্তি নেই, তাকে নিয়ে ফুর্তি-ফার্তা করাতেও আপত্তি নেই। ভাবটা এমন, সোনার আংটি আবার সোজা বাঁকা। ঘরে বাঁধা স্ত্রীটির ভাত কাপড়ের অভাব না হলেই হল। খাওয়া, পরা আর শুধু স্বীকৃতি পাওয়াই তার চরম প্রাপ্তি। মঞ্জুদির স্বামী বাপ ঠাকুরদার মতন ওপর ওপর ভেসে না থেকে একেবারে মজে গেছে। ফিরেও তাকাত না স্ত্রীর দিকে। স্বামীর মতি ফেরাতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি মঞ্জুদি। শেকড়-বাকড়, তাবিজ-কবজ এখনও কত কী যে মঞ্জুদির হাতে বুকে শোভা পায়। শেষ রক্ষা অবশ্য হয়নি। বস্তির মেয়ে স্বয়ং একদিন ঘরে এসে উপস্থিত। সঙ্গে স্বামীর ফরমান—দুজনেই মিলেমিশে, মানিয়ে গুছিয়ে থাকো। তুমি আমার বউ, ঘরের পাখি। ও আমার বনকি চিড়িয়া। ঠোকাঠুকি কোরো না। ঠোকাঠুকি না হলে হয়তো থেকেও যেত মঞ্জুদি। কিন্তু বাহাত্তর ঘণ্টার ভেতর যে গালাগালির হোসপাইপ খুলে দিল নতুন রানি, তার ধাক্কায় মঞ্জুদি সোজা বাপের বাড়ি। সেখানে আবার বাপ দাদার দুশ্চিন্তা। বড় মেয়েকে তার বর তাড়িয়েছে, এতে যদি ছোটর বিয়ের অসুবিধা হয়। তার জন্যও তো একটা সৎবংশজাত সরেস গাছ দরকার। অতএব মঞ্জু সাহার স্থান এই হোস্টেলে। খরচ বাবা, দাদার। মঞ্জুদির বাবার লোহালক্কড়ের ব্যবসা। ইজ্জতের থেকে অর্থ বেশি। বেচারা মঞ্জুদির এখন সারাদিনের কাজ সকালে পুজো, দুপুরে পুজো, সন্ধেয় পুজো। শনিবার মোড়ের শনিতলায় হত্যে দিতে যায়। চওড়া করে সিঁদুর পরে। হাতে গুচ্ছের শাঁখা, লোহা। পুজোর ফাঁকের সময়গুলো মঞ্জুদির কাটে পরনিন্দা, পরচর্চায়। আর শুচিবায়ুতায়। কোনও কিছু কাউকে ছুঁতে দেয় না। মন্দিরাদিও তেমন। ইচ্ছে করে ওর চৌকিতে গিয়ে বসব,—'কী মঞ্জু, তোমার বরের খবর কী?'—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। এমন ভয়ংকর চোখে তাকাবে যেন পারলে ছিঁড়ে খায়,—'কেন? তোমার কী দরকার। তুমি এখান থেকে সরে বসো। যত সব হেগো, বাসি কাপড়—।' খাটের তলা থেকে বার হয়ে যাবে হরলিক্স-এর বোতল।

কী, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? হ্যাঁ, ইনি এই শতাব্দীরই মহিলা। ভাল করে তাকালে আপনার আশেপাশেও এরকম মহিলা পেয়ে যাবেন। এরা সব এক ঝাঁক বিষাক্ত বিশ্বাসের শিকার। মঞ্জুদি এখনও আশা করে আছে, একদিন না একদিন, স্বামীর সুমতি হবে। পতিদেবতা ভিন্ন নিজের অস্তিত্বের কথা মঞ্জুদি ভাবতেই পারে না। আমিও তো শিবপুরে থাকতে প্রায় এরকমই একটা অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছিলাম। নইলে কি আর মরার কথা ভাবি?

দেখেছেন কাণ্ড, কাঁকন আবার সিগারেট ধরিয়েছে। মঞ্জুদির সঙ্গে এই নিয়ে এত অশান্তি হয়! কাঁকন অবশ্য পরোয়া করে না,—তুমিও পয়সা দিয়ে থাকো, আমিও পয়সা দিয়ে থাকি। নিজের পয়সায় সিগারেট খাব তাতে কার কী?—মেয়েটা পারেও বটে। সকাল থেকে খালি পেটে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। ওকে একটু বকা দরকার।

নিজের বিছানায়, হাঁটু মুড়ে বসে গভীর মনোযোগে পার্ট মুখস্থ করছে কাঁকন। বিছানা জুড়ে ছড়ানো বই, ম্যাগাজিন। তাকটাও একদম গোছায় না আজকাল। শ্যাম্পু, ডেটল, টুথপেস্ট, তালা সব এক কোণে ডাঁই। পায়ে পায়ে এগোলাম। নাটকের বই-এ এত মগ্ন যে আমার উপস্থিতি টেরই পায়নি। সামনে পেছনে দুলছে অল্প অল্প। বাঁ হাতে বই, ডান হাতে আগুন। পাশের অ্যাশট্রে টইটম্বুর। ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিলাম হাত থেকে। চমকে তাকিয়েছে,—'কীরে। তোর আজ অফিস নেই?"

—'তুই আগে সিগারেট নেভা। তারপর তোর কথার উত্তর দেব।'

—'মাইরি ঝামেলা করিস না। আজকে ফাইনাল রিহার্সাল। এ জায়গাটা কিছুতেই মুখস্থ হচ্ছে না।'

—'তার জন্য চেন স্মোকিং দরকার? খালি পেটে?'

—'ডেফিনিটলি। কনসেনট্রেশন আনতে গেলে—ও তুই বুঝবি না। পারফর্মিং আর্ট, ক্রিয়েটিভ আর্ট, এ সবে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হলে চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। শম্ভুদা বলতেন, যখন তোমরা কোনও চরিত্রের ভেতরে ঢুকবে—।'

—'আবার? আবার জ্ঞান দিতে শুরু করলি?'

কাঁকন ঠোঁট টিপে হাসল,—'ঠিক আছে বোস। এই জায়গাটা ধর তো। এই যে, আবার বলি

ঔরঙ্গজেব—'

—'এ কী? আবার শাহাজান? আবার জাহানারা? এখনও মুখস্থ হয়নি? গত মাসেও তো করল?'

—'ওরা বেশি পয়সা দেয়নি।' কাঁকন সিগারেট নেভাল,—' প্রম্পট শুনেই ম্যানেজ করেছি। এরা মাইরি মালকড়ি ছাড়বে। ব্যাঙ্ক তো।'

—'কত?'

—'হাজার। তুই ধরবি? না, অফিস যাবি?'

—'অফিস তো যাবই। গতমাসে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলাম। সাতষট্টি টাকা মাইনে কাটা গেছে।' কোমরে আঁচল গুঁজে নিলাম,—'এবার মন্দিরাদি বেরোলেই ঢুকে পড়ব।'

—'তোর গত মাসের ইন্টারভিউটা কী হল রে?'

—'ওটা হবে না। ভেতরে থেকে লোক ঠিক করা আছে। আরেকটা চেষ্টা করছি। আরও বড় জায়গায়। অ্যালেনবেরিতে।' নিশ্বাসটুকু ধরে রাখতে পারলাম না বুকে,—'মালহোত্রা ব্রাদার্সে পড়ে থাকলে চলবে নারে। একটা বেটার কিছু জোগাড় করতেই হবে। কতদিন আর দাদার ভর্তুকিতে চলব? তা ছাড়া এরা বড্ড খাটাচ্ছে। পয়সাও দেয় না—।'

—'তোর সেই তিব্বতি কলিগের খবর কী?' মাথার ওপর দু হাত ছড়িয়ে হাই তুলল কাঁকন। চাঁপা ফুল রং নাইটিটা ওর গায়ের সঙ্গে ভারী মানায়। রোগা, লম্বাটে গড়ন। মুখ চোখে একটু বেশি কাটা কাটা ভাব। বাঁদিকের চিবুকে ছোট্ট বাদামি তিল।

—'ভালই আছে। ওরও শিগগিরই একটা চান্স পেয়ে যাবার কথা। পেয়েও যাবে। ওরা তো ঠিক আমাদের মতো নয়। অনেক স্ট্রেট ফরোয়ার্ড। আমাদের মতো কোনও ক্যাতকেতে প্রবলেম নেই।'

—'ঠিক বলেছিস। মঞ্জুদি, বউদি টাইপ নয়।' কাঁকন আবার সিগারেট ধরাল,— 'মিস্টার মুখার্জিকে দেখেছিলি আজ? কী দারুণ একটা গ্রে স্যুট পরে এসেছিল? হেভি ইনকাম গ্রুপের লোক তো—'

—'হুঁ। ওদের ব্যাপার আলাদা। টাকা দিয়ে ভদ্রলোক গোটা দুনিয়াটা কিনে নিতে পারে। বউদি, বউদির স্বামী, বড়দি, পাড়ার ছেলে—'

—'কিনেই শুধু নেওয়া যায়। পাওয়া কি আর যায় রে?' কাঁকন আলগা ভাবে হাসল,—'তোর সেই সিদ্ধার্থর খবর কী, সেই গুণ্ডা মতন ছেলেটা?'

—'যাহ্, গুণ্ডামতন কেন হবে? ম্যানলি চেহারা বল।'

—'গুণ্ডামতন বললে তোর গায়ে লাগে নাকি?' কাঁকন খিল খিল হেসে উঠল, —'তার মানে তুই প্রেমে পড়েছিস।'

—'কখখনও না। আমি এখন ওকে অ্যাভয়েড করে চলি।'

—'তারও মানে তুই প্রেমে পড়েছিস।' কাঁকন আরও জোরে হাসছে।

—'ইমপসিবল। তোকে এবার পেটাব। আগের ঘাই শুকোল না—'

—'ওই ঘা কি আর শুকোয় রে?' হাসতে হাসতে দুম করে গম্ভীর হয়ে গেল কাঁকন। আস্তে আস্তে একটা কালো ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে ওর মুখ। শরতের উজ্জ্বল আকাশে এভাবেই মেঘ আসে। উদাস চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বাইরের জারুল গাছের দিকে।

—'যা স্নান করতে যা। মন্দিরাটা বেরিয়েছে।'

পেনসিল হিলে খুট খুট শব্দ তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে শুভ্রা। সকালে কোনওদিন হোস্টেলের ভাত খায় না। কী একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করে। মন্দিরাদি বলে, খদ্দের ধরার ফার্ম। জানি না বাবা কত রকম যে চরিত্র দেখছি।

কাঁকন জাহানারার ডায়ালগে মুখ ডুবিয়েছে। এখন কথা বললেও উত্তর দেবে না। মেয়েটা এরকমই। কখনও বর্ষার খোড়ো নদী, কখনও বা ঘন শ্যাওলায় ঢাকা স্থির সবুজ দিঘি। একা, বিষণ্ণ। থাক নিজের মনে। নাটকের মধ্যে ডুবে। চৌকাঠ অবধি গিয়ে ফিরে তাকালাম। মাথার পেছনে টাঙানো ওর মা-বাবার ছবিটা ঝকঝক করছে। রোজ মনে করে মালা বদলায়।

তবে ওই ছবিটা ছাড়াও আরেকটা ছবি আছে ওর কাছে। মণীশের। সেটা ও কখনও বার করে না। আমি জানি।

পাঁচ

লোকটা রোজ বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে কেন বলুন তো? ওই যে ওই লোকটা—রোগা ডিগডিগে চেহারা, বাঁদিকে সিঁথি, চোখে চশমা। বয়স মনে হয় চল্লিশের কাছাকাছি। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা গায়ে মাখিনি। আমি যে বাসে উঠব, সেই বাসটায় ওরও ওঠা চাই। তা উঠতেই পারে। বাস তো আমার নিজের নয়। কিন্তু এখন যেন কেমন গন্ধ পাচ্ছি। চোখাচোখি হলেই লোকটা আজকাল হাসার চেষ্টা করে। কিছু বলতে চায়। হতে পারে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই। হতে পারে...। লোকটা অনিমেষের পরিচিত কেউ নয় তো? কাঠপুতুলের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। শিবপুরে দেখেছে আমাকে? কৃষ্ণনগরে? অনেকটা এরকম দেখতে অনিমেষ মিত্রর এক খুড়তুতো ভাই ছিল। সে অবশ্য আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত। একদিন চুপিচুপি বলেছিল,—'বউদি, আপনি এদের সঙ্গে থাকতে পারবেন না। জেঠিমা আর ফুলদাকে তো হাড়ে হাড়ে চিনি, টাকা আর ধান্দা ছাড়া কিছু ভাবতে জানে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—'এ কথা আপনারা বিয়ের আগে জানাননি কেন? অন্তত বাবা মাকে একটা পোস্টকার্ড যদি দিতেন...'

—'কী করে জানাব? ওরা আগে কাউকে কিছু জানতে দিয়েছিল? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে...আমরা তো জানলামই বিয়ের মাত্র কদিন আগে।'

—'এখনও তো প্রতিবাদ করতে পারেন।'

দেওরটি এ কথার উত্তর দেয়নি। অন্যের ব্যাপারে কে আর সহজে নাক গলাতে চায়! বাইরে থেকে দরদ দেখানোতেই আনন্দ বেশি। এতে এক ধরনের আলাদা সুখবোধ আছে।

ওই লোকটাকে তবে অনিমেষই আমার পেছনে লাগায়নি তো? প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য? থানায়, কোর্টে, সর্বত্র বিপর্যস্ত হয়েছে একসময়। অপমানের কথা সহজে কেউ ভোলে না। দূর, অযথা ভয় পাচ্ছি কেন? লোকটা হয়তো পাড়ারই কেউ। কিংবা আশেপাশে থাকে। কোথায় গেল? ওই তো ডানদিকটায়। সিগারেট ধরিয়েছে। চোখোচোখি হতেই স্যাঁত করে থামের আড়ালে চলে গেছে। ধ্যাৎ, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। উটকো একটা লোককে এত পাত্তা দেওয়ার মানেই হয় না। আসতে চায় আসুক না। যত খুশি পেছন পেছন। অকারণে ভয় পাচ্ছি কেন?

এঃ, দেখুন দেখি, আটটা পঞ্চান্ন হয়ে গেল। সাড়ে নটার মধ্যে অফিস ঢুকতেই হবে। বাস আসছে না কেন? বড় সাহেব ব্যাঙ্গালোর গেছেন, কনফারেন্সে। ভিনোদ মালহোত্রা দিন কয়েকের জন্য সর্বময় কর্তা। এই ছেলেটি একটি চরিত্র বিশেষ। অল্প বয়সে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে গেলে বোধ হয় এমনই হয়। অহংকারী যুবরাজের মতো হাঁটা চলার ভঙ্গি। কথা বলে চিবিয়ে চিবিয়ে। চ্যাটাং চ্যাটাং হুকুম দেয়। মালিক হওয়ার কায়দাকানুন সব আয়ত্তে। তবে মেয়েদের সম্পর্কে মালিকসুলভ দুর্বলতা নেই কোনও। উলটোটাই বরং। মেয়েদের কাজকর্ম, গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর। সামান্য সুযোগ পেলেই থুতুর মতো বিদ্রূপ ছিটিয়ে দেয়। মিনিট দশেক লেট করার জন্য কদিন আগেও কয়েক কথা শুনিয়েছে আমাকে। সবে পি বি এক্স বোর্ড চালু করছি, বেড়ালের পায়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে সোজা কাউন্টারের সামনে,—'আপনার ঘড়িতে এখন কটা বাজে?'

মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিলাম,—'সরি স্যার'।

—'অ্যায়সা কিউ হোতা ম্যাডাম? লেডিজ অলওয়েজ গেট লেট। ইজ নট ইট?'

ভাবটা এমন, মেয়েরা ছেলেদের মতো বাহাদুর নয়। কোনও কাজেই। অতএব কোনওভাবেই আজ দেরি হলে চলবে না। ভিনোদ হাতে মাথা কাটবে।

এবড়ো খেবড়ো রাজপথে টলমল দুলতে দুলতে একটা মিনি আসছে। দেখে মনে হয় উত্তাল সমুদ্রে অদৃশ্য ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছে কোনও জেলে নৌকো। মেট্রো রেল চালু হওয়ার পরও এদিককার রাস্তার অবস্থা বেহাল। এখানে ভাঙা, ওখানে গর্ত। কবে যে সারানো হবে। বাসটায় ভাল ভিড় মনে হচ্ছে? অফিস যাওয়ার সময় অবশ্য কবে আর ফাঁকা বাস পাই। আমার কোমর বাঁধা দেখে লোকটাও পায়ে চেপে সিগারেট নেভাল। অর্থাৎ আজও সহযাত্রী হবে। যা খুশি করুক। এ বাসটায় আমি উঠবই।

এক গুজরাটি দম্পতি নামল হাঁসফাঁস করতে করতে। তারপর পাদানি টপকে, কন্ডাক্টরের গায়ের ওপর আমি। পেছনে নীল শার্ট পরা আরেকজন। তার পেছনে লোকটা। বাসের ঠিক মুখটাতে এত ভিড় থাকে! নীল শার্টকে গুঁতিয়ে লোকটা উঠে আসার চেষ্টা করছে। কী করে মানুষের পাঁচিল ভেঙে যে ভেতরে ঢুকি!

আপনি নিশ্চয়ই কলকাতার মিনিবাসের হাল চাল জানেন? কী মনে হয়? হাঁস-মুরগি বোঝাই চটের বস্তা? না টিনের খোল? দম বন্ধ অবস্থায় ছটফট করছে এক ঝাঁক প্রাণী। কোথাও একদানা সরষে ফেলার জায়গা নেই, কন্ডাক্টর তবু চেঁচিয়ে চলেছে—'পেছনে এগিয়ে যান। পেছনে এগিয়ে যান। এই যে, ও কালো চেক বড় ভাই—'

—'পেছনে আবার এগোনো যায় নাকি?' এর মধ্যেই কে একজন সরস মন্তব্য ছুড়ল।

কালো চেক বড় ভাই খিঁচিয়ে উঠল,—'যাব কোথায়? ভেতরে কি খেলার মাঠ? তুমি চলে এসো। তোমার মাথায় দাঁড়াই।'

রাস্তায় বেরোলে কতরকম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। এই তো দেখুন না, একে রাস্তা খারাপ, তার ওপর দুমদাড়াক্কা ব্রেক চাপছে ড্রাইভার। মানুষের ঘাড়ে ছিটকে পড়ছে মানুষ। একেবারে তালগোল অবস্থা। কোনওরকমে সামনের সিটের রড ধরে নিজেকে সামলালাম। জোর একটা ঢোঁট খেয়েছি ঘাড়ে।

—'অ্যাই ড্রাইভার, কী হচ্ছে কী? মানুষকে মানুষ বলে ভাবো না নাকি? ঠিক করে চালাও।'

—'বুঝছেন না দাদা, ব্যাটা বস্তা ঝাঁকাচ্ছে। আরও কিছু পুরতে হবে যে।'

ভিড়ের চাপে ঘাড় ঘোরানো দায়। লোকটা এখন কোথায়? নিশ্চয়ই আশেপাশেই আছে। আড়ষ্ট হয়ে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছি। আঁচল তুলে কপালের ঘাম মুছব, সে উপায়ও নেই। আরেকটু এগোতে পারলে ভাল হয়। ওই মোটা মতন ভদ্রমহিলা লোয়ার সারকুলার রোডে নামেন। কিন্তু এগোই কী করে? চারদিকে শুধু শরীরে শরীর ঠোকাঠুকি। আমার পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে একজন বুড়ো ভদ্রলোক। হাতের ওপর একটা অপরিচিত হাত। আরে হাতটা যে লোকটারই। সাহস দেখুন, কখন ঠিক সেঁধিয়ে এসেছে পেছনে। বার দুয়েক ঘুরে তাকালাম। ভ্রুক্ষেপ নেই। দৃষ্টি অন্যদিকে উদাস। যত হাত সরাচ্ছি, এগিয়ে আসছে হাত। অন্যমনস্ক ভাবে কীরকম হাতে হাত ঘষছে দেখুন। বলব কিছু? যদি উলটোপালটা বলে দেয়? প্রতিবাদ করতে গেলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাসে ট্রামে মেয়েদের অপমানিত হতে হয়। কোথায় যে যাই। কী বিশ্রী বলুন তো? কী নোংরা? শরীরটাকে যদি কোনও ম্যাজিকে গুটিয়ে ফেলা যেত। মুখ চোখ কি অন্যরকম হয়ে গেছে আমার? বাঁ পাশের ভদ্রলোক এক স্টেপ সরে দাঁড়ালেন যেন। আমার অস্বস্তি নির্ঘাত লক্ষ করেছেন। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, ভদ্র শিক্ষিত। আসলে দু-একটা কামুক পুরুষের জন্য আর সকলেরও কেমন বদনাম হয়ে যায়, তাই না?

যাক, এবার আর আমাকে ছুঁতে পারছে না। আচ্ছা, লোকটার কী ব্যাপার বলুন তো? জানে কি, শান্তিনীড়ে থাকি? হোস্টেলে থাকা মেয়েদের সম্পর্কে কিছু মানুষের ধারণা মোটেই ভাল নয়। অনেকে ভাবে, যে সব মেয়েরা একা থাকে, তারা সকলেই সহজলভ্য। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে কত কী যে জমা হচ্ছে রোজ।

একবার কী হয়েছিল জানেন? তখন প্রথম কলকাতায় এসেছি। মাত্র দেড়-দু মাস। কিছুই চিনি না। হোস্টেল থেকে অফিস যাই। অফিস থেকে হোস্টেল। তাও ভয়, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলি! যদি ঠিক জায়গায় না পৌঁছতে পারি! মাঝে মাঝে ছোট মাসির বাড়ি যাই। তাও মেসো বা সিদ্ধার্থর সঙ্গে। সিদ্ধার্থই আমাকে একটু একটু করে কলকাতা চিনিয়েছে। কৃষ্ণনগর গেলে ট্রেনে পর্যন্ত তুলে দিয়ে আসত। সেই ভিতু আমি একদিন গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থর জন্য অপেক্ষা করছি। আমাকে লাইট হাউসে 'বর্ন ফ্রি' দেখাতে নিয়ে যাবে। ছুটির দিন। তবু ভালই ভিড় ছিল রাস্তাঘাটে। পশ্চিমের সূর্য সোজা চোখে পড়ছে বলে ছায়ায় সরে দাঁড়ালাম, বাটার সামনে। হঠাৎ একটা লোক, হাতে ব্রিফ কেস, গলায় টাই, একদম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটা যে আমাকেই কিছু বলছে বুঝতেই পারিনি। একেবারে কানের কাছে এসে ফিসফিস করতে চমকে তাকিয়েছি।

—যাবে নাকি? লোকটা কায়দা করে হাসছে।

আমি অবাক চোখে এদিক ওদিক তাকাই। আমাকেই বলছে কি? ভাবার আগে একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে লোকটা,—'এসো না, দুটো টিকিট আছে লাইট হাউসে।'

তবু ব্যাপারটা বুঝে উঠতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল। লোকটা আমাকে কলগার্ল ভেবেছে। ঘৃণায়, অপমানে সঙ্গে সঙ্গে মুচড়ে উঠেছিল শরীর। আমাদের কি স্বাধীনভাবে একা কোথাও দাঁড়িয়ে থাকার অধিকার নেই? ঠোঁট দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে। কানে মাথায় হুল ফোটাচ্ছে লক্ষ বোলতা। মানুষ নয় যেন একটা নোংরা পোকা এগিয়ে আসছিল ক্রমশ,—'নতুন নাকি? চিন্তা নেই। পুষিয়ে দেব...'

তাড়া খাওয়া খরগোশের মতন ছুটতে শুরু করলাম আমি। ছুট ছুট। গ্র্যান্ড হোটেল টপকে সুরেন ব্যানার্জির মুখে আসতেই সামনে একটা বাস। ল্যান্সডাউন দিয়ে যায়। কোনওদিকে না তাকিয়ে আমি সোজা সেই বাসের ভিতর। সিদ্ধার্থ চিন্তা করবে। করুক। ওদের কখনও আমাদের মতো গায়ে কাদাজলের ছিটে খেতে হয় না। গা ঘিনঘিন করছে। পদ্মপুকুর না আসা অবধি সারাটা রাস্তা শুধু গা গুলোনো ভাব। হোস্টেলে ফিরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম।

কাঁকন শুনে খুব বকেছিল,—'তুই কিছু বলতে পারলি না? এমনি এমনি ছেড়ে দিলি লোকটাকে? পায়ে চপ্পল ছিল না? কিছু না হোক চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে পারতিস। পাবলিকের হাতে আড়ং ধোলাই খেলে আর কোনওদিন বাছাধন—'

কী করে কাঁকনকে বোঝাই, তখন যে আমাকে বোবায় ধরেছিল। কোনও শব্দই বেরোত না মুখ থেকে।

মন্দিরাদি বলেছিল,—'লোকগুলোর দোষ কী? আজকাল খদ্দের ধরার জন্য মেয়েগুলো যেভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। ও সব অঞ্চলে কোনও ভদ্রমেয়ের পক্ষে একা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সত্যি অস্বস্তিকর।'

সেই থেকে কখনও ওদিকে একা কারুর জন্য অপেক্ষা করি না। তা বলে বাসের ভেতরেও...। তিন নম্বর সিটে একজন হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। যদিও ভেতরটা অসম্ভব গরম, জানলার ধারে বসা মেয়েটির চুলে দিব্যি বসন্তের বাতাস। মিনি বাসে যারা বসতে পায় তারা যেন লটারি পাওয়া মানুষ। অন্তত মুখ চোখ দেখে তাই মনে হয়। ওই ভাগ্যের চেয়ারে পৌঁছনোর জন্য নিরন্তর মিউজিকাল চেয়ারের খেলা চলেছে। লোয়ার সারকুলার রোডেও বসতে পেলাম না। আমি বসতে যাব, তার আগেই বিশাল চেহারার একজন হুমড়ি খেয়ে বসে পড়েছে। শিভালরি শব্দটা এ যুগে অচল। যতই কষ্ট হোক কেউ ইঞ্চি জমি ছাড়বে না আমাকে। এটাই নিয়ম, এ যুগটা শুধুই দখল নেওয়ার। আমি অন্যায় আশা করবই বা কেন?

ড্রাইভারের পাশের সিটের দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে কন্ডাক্টরের কেমন ঝগড়া লেগেছে শুনুন।

—'নোট দেখাবেন না।' কন্ডাক্টর জংলি গলায় খিঁচিয়ে উঠল,—'খুচরো নিয়ে ওঠেন না কেন?'

—'পাব কোত্থেকে? পাড়ব।'

প্রত্যেকটি বাসে রোজ খুচরো নিয়ে এই ঝামেলা। হেল্পারটা একটা অশ্লীল মন্তব্য ছুড়ল। বাজি ধরে বলতে পারি, কন্ডাক্টরের ঝোলায় কম করেও পঞ্চাশ টাকার খুচরো আছে। কী করে এত খুচরো দিয়ে? মিনিবাসের কন্ডাক্টর হেল্পারগুলো এরকম কেন? কেমন যেন উগ্র, উদ্ধত। কোন সমাজ থেকে এরা আসে? এত কেন হিংস্রতা চোখে মুখে? দুনিয়ার তাবৎ মানুষের প্রতি এদের এক ধরনের অবজ্ঞার ভাব। প্যাসেঞ্জারদের কিছুতেই শুয়োর ছাগলের থেকে বেশি মর্যাদা দিতে নারাজ।

এত কথা কাটাকাটি চলছে, তবু লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে আমাকেই দেখছে দেখুন। কতক্ষণ মুখ ঘুরিয়ে রাখব? কেউ একভাবে তাকিয়ে থাকলে এমনিই তার দিকে চোখ চলে যায়। পার্ক স্ট্রিটে বেশ খালি হয়েছে গাড়ি। ময়দানের সিথি চিরে এখন হই-হই করে ছুটছে।

লোকটা যেন একদম আমার দিকে না আসে। তার থেকে এখন পাশে যে ছেলেটি, লম্বা বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, তার স্পর্শ অনেক ভাল।

ব্যাগ খুলে টিকিটের পয়সা বার করলাম,—'এই যে ভাই, টিকিটটা।'

কন্ডাক্টর ফিরে তাকানোর আগেই, সামনে থেকে ঝুঁকে পড়েছে লোকটা,

—'আপনার টিকিট আমি করে নিয়েছি মিসেস মিত্র।'

একী? লোকটা আমার নাম জানল কী করে? স্পর্ধা দেখুন, টিকিটও কেটেছে। কোনওদিন তো এত

বাড়াবাড়ি করে না!

আজ মতলবটা কী? রাগ থেকে আশঙ্কা, আশঙ্কা থেকে একটা অজানা ভয় কুয়াশার মতো চারিয়ে যাচ্ছে আমার ভেতরে। কী হবে? নিশ্চয়ই তা হলে অনিমেষ...। গ্রেট ইস্টার্নের সামনে বাস থামতেই প্রায় লাফিয়ে নেমে গেলাম। স্টিফেন হাউস অবধি হাঁটতে হবে। বুঝতে পারছি লোকটাও নেমেছে। জোরে, খুব জোরে পা চালালাম।

—'শুনছেন? এই যে এদিকে—'

কিছুতেই আমি দাঁড়াব না। প্রায় ছুটতে শুরু করলাম।

—'এক মিনিট মিসেস মিত্র—' লোকটা আমাকে ধরে ফেলেছে,—'আপনি আমাকে ভুল ভাবছেন...'

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম,—'কে আপনি? আমার নাম জানলেন কী করে?'

—'না, মানে, চন্দনাকে চেনেন? আপনার কৃষ্ণনগরের বান্ধবী?'

—'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

—'চন্দনা আমার শালার বউ। আমি আপনাদের হোস্টেলের কাছেই থাকি। তিনটি বাড়ি পরে। আমার নাম শ্রীকান্ত মজুমদার—'

একটু যেন আশ্বস্ত বোধ করছি। লোকটার একটা পরিচয় তবু পাওয়া গেল। কিন্তু শ্রীকান্ত মজুমদার, তুমি তো সহজ লোক নও। বাসের ভিড়ে, সুযোগ বুঝে দিব্যি হাতে হাত ঘসছিলে।

—'আমাকে চিনলেন কী করে?'

—'চন্দনার কাছে আপনার ছবি দেখেছি। চন্দনা আপনার সব কথাও বলেছে আমাদের। সত্যি খুব স্যাড ইনসিডেন্ট। ওই বলছিল আপনি শান্তি নীড়ে আছেন। কদিন লক্ষ করে, খোঁজ নিয়ে—'

ব্যাপারটা তা হলে এই? ডিভোর্সি মেয়ের দুঃখে বিগলিত পুরুষ? রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। হাজার হোক চন্দনার ননদের বর। গলাটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম,—'আমাকে কিছু বলার আছে আপনার?'

—'না, এমনিই।' শ্রীকান্তবাবু চুলে হাত বোলালেন,—'অনেকদিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে। কিন্তু আপনি যা গম্ভীর। অবশ্য এত অল্প বয়সে এরকম একটি মিস্‌হ্যাপ...খুব খারাপ লাগে আপনাকে দেখলে। আপনারও ভীষণ একা লাগে না?'

ধীরে ধীরে শ্রীকান্ত মজুমদার আমার সামনে পুরোপুরি বিকশিত হচ্ছেন। লোকটি আদ্যন্ত চরিত্রহীন। সহানুভূতির মুখোশ পরে একটু গায়ে গা ঘসতে চায় আর কী। এরকম দু-একজন আমি কৃষ্ণনগরেও দেখেছি। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করলাম,—'আপনার অফিস কোথায়?'

—'এই তো ইউ বি আই...'

—'ও আচ্ছা। আমি সোজা যাব। আমার দেরি হয়ে গেছে।'

—আপনার অফিস ছুটি হয় কটায়?'

উত্তর না দিয়ে দৌড়ে মিশন রো পার হয়ে গেছি। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। শ্রীকান্ত মজুমদার গ্র্যান্ড হোটেলের নীচের সেই লোকটার থেকেও নোংরা। ঘরে বউ-বাচ্চা আছে, তারপরেও উপরি আমোদ আহ্লাদের শখ। আমাকে নিয়ে। আমি কী? অপমানে মাথার হাজার হাজার কোষ একসঙ্গে দপদপ করছে। অফিসে ঢুকেও হাঁপাচ্ছি। কাউন্টারে ভ্যানিটি ব্যাগ ছুড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোট সাহেবের এক্সটেনশন ঝ্যাঁ ঝ্যাঁ বেজে উঠেছে। রিসিভার তুললাম,—'গুড মরনিং স্যার।'

—'ইউ এগেন লেট টুডে।' ও প্রান্তে ভিনোদ মালহোত্রার রাগী কণ্ঠস্বর। বড়সাহেব না থাকলে ছোটটির প্রতাপ আরও বেড়ে যায়। অফিসের ঘড়িতে নটা পঁয়ত্রিশ। খুব একটা দেরি তো করিনি!

—'ইউ শুড ট্রাই টু বি মোর পাঙচুয়াল।' ভিনোদ চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল,—'এনিওয়ে, আপনার টেবিলে কয়েকটা চিঠি রাখা আছে, তাড়াতাড়ি কপি করে দিন।'

আসলে ওই নোংরা লোকটা। ওর জন্যই পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। এরপর কোনওদিন কথা বলতে আসুক...। সামান্য দম নিয়ে টাইপ রাইটারের ঢাকা খুললাম। একটু জল খেলে হত। এখনও কান দুটো গরম হয়ে আছে। থাক, জল পরে। আগে ভিনোদের কাজ। বদ্রিও এখখুনি আবার জি পি ও থেকে

ডাক নিয়ে আসবে। এক্সচেঞ্জের রুপোলি দরজা খুলে গেল। বাইরের কল আসছে।

—'গুড মরনিং। মালহোত্রা ব্রাদার্স হিয়ার।'

—'মরনিং রাই...কোনও খবর নেই কেন? কেমন আছ?'

মাথার জমাট বারুদ দাউ দাউ জ্বলে উঠল। সিদ্ধার্থ। ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম। তরল সিসের মতো ফুটন্ত ক্রোধ উঠে আসছে ঠোঁটের ডগায়—'কী চান আপনি বলুন তো? কেন আমার পেছনে ঘুরে মরছেন?'

—'কী বলছ রাই? তোমার গলা এত কাঁপছে কেন? কী হয়েছে?'

—'ন্যাকামি করবেন না। ভাবেন কিছু বুঝতে পারি না?' উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি,—'কী মনে করেন আপনারা আমাদের? ডিভোর্সি বলে বেওয়ারিশ? লেবেল আঁটা নেই বলে যে ভাবে খুশি ব্যবহার করবেন?'.. ... ...

—'কখখনও আর ফোন করবেন না, বুঝলে এ এ ন।' রিসিভারটা ক্রেডল-এর ওপর আছড়ে দিয়েছি। ঠকঠক করে হাত পা কাঁপছে। চোখ বন্ধ করলাম। আবার খুললাম। চারদিক কেমন ধোঁয়াটে লাগছে। সামনে বুঝি মেঘের স্তর। আবছাভাবে ফুটে উঠছে কয়েকটা মুখ। আমার সামনে এত লোক কেন? আমি কি খুব জোরে চিৎকার করে ফেলেছি?

শার্লি কাউন্টারের ভেতর ঢুকে এসেছে। আমার কাঁধে হাত।

—'হোয়াটস রং রাই?'

মিস্টার মেনন সামনে ঝুঁকেছেন,—'কার ফোন ছিল? এনি ব্যাড নিউজ?'

ছি, ছি, ছি, ছি। কী হাস্যকর সিন ক্রিয়েট করে ফেলেছি আমি! আমার চিৎকারে এরা সবাই ছুটে এসেছে এখানে? ইশ, মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। এই মুহূর্তে যদি ধুলো বালি হয়ে যেতে পারতাম! দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা নাড়ার চেষ্টা করছি,—'নো, নাথিং। ইটস ওকে।'

একে একে সকলে চলে যাচ্ছে কাউন্টারের সামনে থেকে। ডোমা, শার্লি, মিস্টার মেনন, ব্যানার্জিদা। অজয় সিনহাও। প্রতিটি মুখে এখনও বিস্ময়। উঠে টয়লেটে গেলাম। আর পারছি না। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললাম। এত জলও ছিল আমার চোখে!

ছোট সাহেব লাঞ্চে বেরিয়েছে একটু আগে। মিস্টার মেননও উঠে টিফিন রুমে গেলেন। ছ তলার বিশাল হলঘর জুড়ে দুপুরের শুকনো নীরবতা। মাথার ওপর সাবেকি কড়িকাঠ থেকে গোটা দশেক ফ্যান নিঃশব্দে ঘুরে চলেছে। হলের তিনদিকে তিনটে কাচের চেম্বার। একদিকে ক্যাশ, একদিকে মালিকরা। ওপারে, আমার মুখোমুখি চেম্বারে তিনজন স্টেনোগ্রাফার—ডোমা, শার্লি, ক্রিশ্চিন। ক্রিশ্চিন আজ আসেনি নাকি? ওর সিটটা এখান থেকে ভাল দেখা যায় না। অজয় সিনহার মাথা আড়াল করে রাখে। আগে সিনহা বাঁদিকে ক্যাশ চেম্বারের সামনে বসত। কিছুদিন হল ব্যানার্জিদার সিটে এসেছে। ব্যানার্জিদা গেছেন মিস্টার মেননের পাশে। অন্যদের সিট ব্যানার্জিদা আর মিস্টার মেননকে ঘিরে।

মাথাটা আস্তে আস্তে হালকা হচ্ছে। একবার ক্রিশ্চিনের খোঁজ করে আসি। তার আগে টাইপ করা চিঠিগুলো ঠিক মতন পিন করা দরকার। ভুলটুল হয়নি তো? আলগা চোখ বুলিয়ে নিলাম। ইনকামিং চিঠির ফাইল ভিনোদের ঘরে রেখে আসতে হবে। বদ্রি নেই। বাইরে গেছে। কাউন্টার ছেড়ে উঠেছি, ডোমা কাচের দরজা ঠেলে বেরোল। ওরও হাতে টাইপ করা চিঠি। আমাকে দেখে, নরম হেসে, হাত ওঠাল। আমি জানি, মেয়েগুলো আর আমার কাছে এসে কোনও প্রশ্ন করবে না সকালের ঘটনা নিয়ে। এরা কখনও অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। তা বলে ভাববেন না যেন মেয়েগুলো আত্মকেন্দ্রিক। এখখুনি যদি ওদের কাছে সাহায্য চাই, ঝাঁপিয়ে পড়বে। আসলে ওরা বুঝে পেঁছে সকালের ঘটনাটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত। আমি নিজে থেকে এদের কিছু না বললে...। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে এখানেই ওদের তফাত। কিন্তু ওই সিনহাটাকে দেখুন, এমনভাবে সকাল থেকে আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে...। ব্যানার্জিদাও বার কয়েক ঠারেঠোরে প্রশ্ন করে গেছে। মিস্টার মেনন একদম অন্য রকম। মাথাজোড়া টাক, বেঁটেখাটো চেহারার এই দক্ষিণী মানুষটির মধ্যে কেমন যেন বাবা বাবা ভাব।

চোখে মুখে আরেকবার জল দিয়ে এসে ডোমাদের ঘরে ঢুকলাম। বাবা! সবাইকেই আজ কিছু

কাজের বোঝা চাপিয়েছে ভিনোদ। এখনও একমনে টাইপ মেশিনে ঝড় তুলে চলেছে শার্লি। নাহ্, ক্রিশ্চিন আজ আসেনি।

—'তোমরা আজ টিফিন করবে না?'

—'হোয়াটস দা টাইম?' ডোমা ঘড়ি দেখল,—'চলো, নীচে গিয়ে ধোসা খেয়ে আসি।'

—'আজ ক্রিশ্চিনের কী হল?'

—'যাক।' রোলার ঘোরাতে ঘোরাতে হাসছে শার্লি,—'এতক্ষণে তবে তুমি লক্ষ করেছ?'

লজ্জা পেয়ে গেলাম। সত্যি, সকাল থেকে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে আছি! ডোমা উঠে গাঢ় লাল স্কার্টটা ঝাড়ছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়না বার করে টুক করে নিজেকে দেখে নিল। শার্লি দারুণ লেসের কাজ করা একটি মিডি পরেছে। উঠে বয়কাট চুলে ব্রাশ চালাল,—'প্রব্যাবলি ম্যাথুজ ইজ গোয়িং অন সানডে। দ্যাটস হোয়াই ক্রিশ্চিন...'

হাঁ করে ঠোঁটের কোনার লিপস্টিক মুছল ডোমা, হেয়ারব্যান্ড টান টান করল,—'ক্যান উই আস্ক আ কোয়েশ্চেন রাই? ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড?'

—'সিওর।'

—'কোনও সমস্যায় পড়েছ কি? সাহায্য দরকার?'

—'না, না, তেমন কিছু না।' জোরে জোরে মাথা নাড়লাম,—'ইট ওয়াজ আ বোগাস কল। সামবডি ওয়াজ ট্রায়িং...'

—'তোমার চেনা সে?' শার্লির ছোট ছোট চোখ দুটো আরও ছোট হল।

সত্যি কথাটা বলব এদের? থাক। আবার মাথা নাড়লাম,—'চিনিই না লোকটাকে।'

—'বাট ইউ গট সো এক্সসাইটেড। হি মাস্ট বি ইনসাল্টিং ইউ। আগে কখনও করেছে? না আজ প্রথম? নাম জানো?'

—'কিছুই জানি না। একেবারে স্ট্রেঞ্জ কল।'

—'ও, হি মাস্ট বি আ বাস্টার্ড। ও কে, এবার যদি কখনও ডিসটার্ব করে, কল মি। আই উইল টিচ দ্যাট সানোভাবিচ।'

প্রাণভরে লোকটাকে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে শার্লি আর ডোমা। এবার আমার খুব খারাপ লাগছে। বেচারা সিদ্ধার্থ। ওকে আমার ওভাবে বলা মোটেই উচিত হয়নি। কোনওদিন তো আমার কাছে কোনও কুপ্রস্তাব করেনি ও। বরং সাহায্যের হাতই বাড়িয়ে দিয়েছে সবসময়। আমাকে নরমাল করার চেষ্টা করেছে। অত্যন্ত অন্যায় করেছি আমি। ফোন করে ক্ষমা চেয়ে নেব? মীরাদির কথায় সিদ্ধার্থ প্রথমদিনই কত সহজ মনে আমাকে শালিনীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কে কাঠ হয়ে বসে ছিলাম গোটা রাস্তা ট্যাক্সিতে। একটাও কথা বলিনি। শালিনীর অফিস থেকে ছোট মাসির বাড়িতে আমাকে পৌঁছে দিয়ে ও বলল,—'যাই তা হলে।'

লোকটা আমারই কাজে সারাটা দিন ঘুরেছে। কিছুটা কৃতজ্ঞতায়ই বোধ হয় বলে ফেললাম,—'ভেতরে আসবেন না?'

ছোট মাসিও তখন বেরিয়ে এসেছে,—'টুকুনকে আবার আমাদের বাড়ি আসার জন্য বলতে হবে নাকি? আয় টুকুন, চা খেয়ে যা। কাজ হল আজ?'

—'আরেকদিন আসব।' সিদ্ধার্থ চোখ ঘোরাল,—'আপনার এই বোনঝিটির সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকা সেফ নয়।'

—'কেন? কী করেছে রাই?'

—'ওরে বাপ। যা গম্ভীর। আমি বাবা রাগী মহিলাদের ভীষণ ভয় পাই।'

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে ছোট মাসি হেসে কুটিপাটি। আমি অপ্রস্তুতের এক শেষ,—'বা, আমি রাগ দেখালাম কোথায়?'

—'একটাও কথা বলেছেন আমার সঙ্গে?'

আমি চুপ।

—'জানো মণিদীপাদি, এতটা রাস্তা এলাম গেলাম, তোমার বোনঝি এমন সিঁটিয়ে বসে রইল

ট্যাক্সিতে যেন আমি জ্যান্ত বাঘ।'

সিদ্ধার্থ এ রকমই। খোলামেলা, সরল, হাসিখুশি। একদিন-দুদিন দেখা হওয়ার পর নিজে থেকেই আপনি থেকে তুমিতে চলে গেছে। এত স্বাভাবিক সেই যাওয়া যে, অস্বস্তি হওয়াব কোনও অবকাশ পাইনি। দ্বিতীয় দিনে বলেছিল,—আপনার যখনই গম্ভীর গম্ভীর ভাব আসবে, আমাকে স্মরণ করবেন। তিন মিনিটে আপনাকে হাসিয়ে দেব।'

আজ বোধ হয় আমার ব্যবহারে হতবাক হয়ে গেছে। প্রথমটা কী যেন বলার চেষ্টা করছিল। ছি, ছি, কী ভাবল আমাকে? না, ফোন নয়। ওদের বাড়িতে যাব। সামনাসামনি ক্ষমা চাওয়া উচিত। একটা ভদ্র ছেলেকে অকারণে অপমান করার কোনও অধিকার নেই আমার।

ছয়

চারদিকের উদ্দাম কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে জায়গাটা যেন নির্জন দ্বীপ, একলা, নিশুতি। কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একদিন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল সিদ্ধার্থ,—'চলো, তোমাকে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

লাল প্রাসাদের মতো সরকারি অফিসবাড়িটা পার হলে একটা টানা লোহার পাঁচিল, খাঁজ কাটা কাটা। মাঝখানে উঁচু গেট। আমি বললাম,—'এটা তো একটা চার্চ।'

—'আরে এসোই না।' সিদ্ধার্থ ভেতরে ঢুকল।

মোরাম বিছানো রাস্তার দুধারে সবুজ ঘাস আর ঘাস। কয়েকটা অশোকগাছ পর পর সেখানে খোঁপা বেঁধে দাঁড়িয়ে। চার্চের পেছনে ছোট্ট এক সমাধি স্থান, ভাঙা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বুনো ঘাস আর আগাছায় ঢাকা জায়গাটার বাঁদিকে কোমর ভাঙা একটা বুড়ো স্তম্ভ। সিদ্ধার্থ সেদিকে আঙুল তুলে বলল,—'চেনো এটাকে? হলওয়েল মনুমেন্ট। সেই যে ফোর্ট উইলিয়ম দখলের সময় কয়েকশো ইংরেজকে অন্ধকূপে নাকি মেরে ফেলেছিল সিরাজ, তারই প্রতিবাদে...'

—'আচ্ছা, এই সেই মনুমেন্ট? ইতিহাসে পড়েছি।'

—'নেতাজি বলেছিলেন হলওয়েলের এই ইতিহাস মিথ্যে। তাঁর আন্দোলনের ফলেই ময়দান থেকে মনুমেন্টকে সরাতে বাধ্য হয়েছিল ইংরেজরা। তারপর থেকে এটা এখানেই।'

আমি অবাক চোখে তাকিয়েছিলাম।

সিদ্ধার্থ ডানদিকে আঙুল তুলেছিল,—'ওটা কী বলো তো? ওই শ্যাওলা ধরা গোল গম্বুজঅলা ঘরটা?'

—'জানি না।'

—'যাও। ওখানেই ভদ্রলোক তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কলকাতায় নতুন এলে ওর সঙ্গে দেখা করে যেতে হয়।'

কথা বলতে বলতে সিদ্ধার্থ ভাঙা ঘরটায় ঢুকে পড়েছে। ঠিক ঘর নয়, ঘরের মতো। কয়েকটা থাম আর সিমেন্টের দেওয়ালে ঘেরা। মাথার খোলাছাতা, ছাদ, প্রাচীন, কালচে। ছাদের নীচে মাকড়সার জাল গাঢ় হতে হতে কোথাও ঘন কালো হয়ে ঝুলছে। ঘরটার পাহারাদার কিছু দামাল ঘাস, বুনো লতা। দেওয়ালের গায়ে রোমান হরফে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব লেখা।

সিদ্ধার্থ ঠোঁট জড়ো করে হাসল,—'কী হল? সেলাম জানাও।'

—'কাকে?' আমার ভুরু কুঁচকে গেল। ওর রসিকতা তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সিদ্ধার্থ একটা ইট বার হয়ে যাওয়া থামে হেলান দিল,—'এখানে মাটির নীচে যিনি শুয়ে আছেন, তিনিই তিনশো বছর আগে পত্তন করেছিলেন এই শহরটার। তুমি যে আজ এখানে চাকরি করতে এসেছ...।'

—'জোব চার্নকের সমাধি এটা! তাই!'

—'ইয়েস ম্যাডাম।'

সিদ্ধার্থর সেদিনকার হাসিখুশি মুখটা ভাসছে যেন চোখে। পায়ে পায়ে কখন চার্চের পিঠের দিকে চলে এসেছি। একটা মালীগোছের লোক কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল আমাকে। তারপর ঢুকে গেল

গির্জায়। কোনও মেয়ে বোধ হয় এসময় একা এখানে আসে না। ঢং ঢং করে বড় ঘড়িতে ছটার ঘণ্টা বাজছে। বাইরের প্রচণ্ড কোলাহলের কাছে এই ঘণ্টাধ্বনি পৌঁছতে পারে না। পাঁচিলের ওপারেই অফিস আদালত ভাঙা উত্তাল জনসমুদ্র। গাড়ি, মিনিবাস ছুটছে এলোপাথাড়ি। এত সব ভিড় আর আওয়াজের মাঝখানে এই ছোট্ট সমাধিস্থানটুকু কী অদ্ভুত রকমের শান্ত। একরাশ ভারী বাতাস বুকে নিয়ে অনন্তকাল ধরে নিঃশব্দে পড়ে আছে। পড়েই আছে।

শেষ ফাল্গুনের অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে। আলগা বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা, নরম, এলোমেলো। নিচু হয়ে একমুঠো ঘাস ছিঁড়লাম। সেদিন এসেছিলাম সিদ্ধার্থর সঙ্গে। আজ একা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক তার সামনেই এক মিলিটারি কর্নেলের সমাধি। সাদা ফলকের ওপর ম্লান হয়ে আসা জাঁদরেল নামটা আবছা আলোয় ভাল পড়া যাচ্ছে না। কর্নেলের সামান্য তফাতে শুয়ে এক যুবক। জন্ম বারোই জানুয়ারি, সতেরোশো তিন, মৃত্যু আঠাশে এপ্রিল সতেরোশো সাতাশ। যুবকের পাশে এক হতভাগ্য স্বামীর তরুণী স্ত্রী। সাতসমুদ্র পার হয়ে এই ভারতবর্ষে এসে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছিল। আড়াইশো বছর আগে চার বছরের বাচ্চাটা মারা গেছে কলেরায়। এখনও তার স্মৃতিফলকে টলটল করছে বাবা মার চোখের জল। ঠিক সেদিনের মতো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

সিদ্ধার্থ বলেছিল, 'এখানে এসে মাঝে মধ্যে আমি অতীতের সঙ্গে গল্পগুজব করে যাই। বুড়ো সাহেব ভাল আড্ডা মারতে পারে।'

জোব চার্নকের সমাধির সামনে গিয়ে মাথা নিচু করলাম,—'গুড ইভনিং স্যার।'

—'গুড ইভনিং মাই ডিয়ার লেডি। আজ একা? পার্টনার কোথায়?'

—'পার্টনার নয় স্যার। হি ইজ জাস্ট মাই ফ্রেন্ড। ও কি এর মধ্যে আপনার কাছে এসেছিল?'

—'নোওও।' জোব চার্নক সুর করে মাথা দোলালেন,—'তুমি তাকে খুঁজছ?'

—'ইয়েস স্যার। সেদিন হঠাৎ তাকে অপমান করে ফেলেছি। খুব খারাপ লাগছে।'

—'দেন গো টু হিম অ্যান্ড অ্যাপলোজাইজ।'

—'পারছি না স্যার। কদিন ধরে চেষ্টা করছি। যদি ও অন্য কিছু ভেবে বসে? যদি ধরে নেয় আমারও দুর্বলতা এসেছে? কয়েকবার ডায়ালও করেছি ওর অফিসে। রিং হলেই কেটে দিই। বাড়ি যাব ভাবি, রাস্তায় বেরোলে পা আটকে যায়। কী বলব দেখা হলে?...আমি লজ্জিত?...দুঃখিত?...আমাকে ক্ষমা করে দিন?...না স্যার, আমার ভীষণ আনইজি লাগছে।'

—'গিয়েই দ্যাখো না। ছেলেটা তো ভাল। সুন্দর চেহারা, লাইভলি। মনটাও অনেক পরিষ্কার।'

—'বন্ধু হয়েই থাকুক না। কিন্তু বড় বেশি ও এগিয়ে আসতে চায়। একদম কাছে।'

—'মন্দ কী? তুমি তো জীবনটাকে নতুন করে শুরুই করেছ। আবার নতুন করে একবার...'

সাহেব বলে কী। আবার সেই আগের মতো...!

দুদিকে মাথা নাড়লাম,—'তা হয় না স্যার। আপনি তো সব জানেন। আমার এখন প্রচুর কাজ। পি এস সি-র পরীক্ষায় বসতে হবে...ভালভাবে পেট চালানোর মতো একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে...মানে সেলফ সাফিশিয়েন্ট হতে হবে। এখনও তো নিজেকে খুঁজছি।'

—'পুয়োর চাইল্ড। নিজেকে খোঁজা কি কোনওদিন শেষ হয়? কারুর?'

—তা হয়তো হয় না। কিন্তু একটা গোটা মানুষ হওয়ার জন্য...আমার যে ভেতরে এখনও বড্ড ভয়। কৃষ্ণনগরে চলে আসার পর যে আতঙ্কটাকে ক্রমশ কাটিয়ে উঠতে চাইছি, তা কেন মাঝে মাঝেই ফিরে আসে? কেন চন্দনার ননদাইকে দেখলে আমার পা কাঁপে? কেন সে দিন অনিমেষের দিদিকে রাস্তায় দেখে ওভাবে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম? ওর সেই ভাগ্নিটা, ছোট্ট এতটুকুন, বিয়ের পর সারাক্ষণ আমার গায়ে লেপটে থাকত সে যখন আমার দিকে 'নতুন মামি' বলে ঝাঁপিয়ে এল, কেন গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল আমার? মনে হচ্ছে যতটা এগোতে চাই, ততটাই পিছিয়ে যাই বারবার। এত ভয় আর গ্লানি আমার জীবনে।'

—'তুমি কি সিসিফাসের গল্প জানো? সেই গ্রিক ছোকরার? দেবতার অভিশাপে সে জীবনভর একটা ভারী পাথরকে ঠেলে ঠেলে তুলত পাহাড়ের ওপর। কিছুদূর উঠেই পাথরটা গড়িয়ে নেমে যায় নীচে। আবার তখন নতুন করে শুরু হত তার পাথর ঠেলা। কষ্ট হত খুব। দারুণ পরিশ্রম। তবু ঠেলত।'

—'তার ওপর তো অভিশাপ ছিল। কিন্তু আমি কী করেছি?'

—'নো ডিয়ার, অভিশাপটাই বড় কথা নয়। আসলে সব মানুষই হল সিসিফাস। তুমিও। অবশ্য তুমি যদি নিজেকে পুরোপুরি মানুষ বলে ভাবতে চাও।...ওই পাথর ঠেলাটাই জীবন।'

—'আমি অত বুঝি না। আমি শুধু শান্তি চাই।'

—'বেঁচে থাকতে গেলে অশান্তি থাকবেই। ইটস পার্ট অফ লাইফ। মৃত্যুই একমাত্র...'

—'তাই তো আমি মরতে চেয়েছিলাম।'

—'সেটা আরও বোকামি। তোমরা বাঁচতেই জানো না। ফার্স্ট ইউ ট্রাই টু নো হাউ টু লিভ, দেন থিঙ্ক অফ ডেথ। তোমরা মনের দিক দিয়ে এখনও সেই লীলার টাইমেই পড়ে আছ।...তাকাও চারদিকে। গেট ইনভলভড।'

—'আপনি আমার দাদার মতো কথা বলছেন।'

—'রাইট। আমরা তোমাদের রেসকিউ করতে পারি। লীলাকে তুলে আনতে পারি সতীদাহের চিতা থেকে। তারপর এই পৃথিবীতে নিজেদের জায়গা খুঁজে নেওয়ার কাজ তোমাদের। আমাদের নয়।'

বাইরে একটা প্রাইভেট গাড়ির হর্ন আটকে গেছে। তীক্ষ্ণ চিৎকারে ফালা ফালা চারিদিক। চার্নক সাহেব থমকে গেছেন। হয়তো বিরক্তও। এখন আর কোনও কথা বলবেন না। কাঁধের ওপর আঁচল গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। চার্চ কি সন্ধের পর বন্ধ হয়ে যায়? কেউ আসে না? দুজন ফাদার সাদা অ্যাম্বাসাডার চড়ে বেরিয়ে গেলেন। মালীটা আবার বেরিয়ে দূর থেকে দেখছে আমাকে। দিনের বেলা মাঝে মাঝে প্রেমিক-প্রেমিকারা এখানে এসে বসে। এই অন্ধকারে মালী আমাকে পাগল টাগল ভাবছে না তো?

অফিসপাড়া একটু পরেই নাক ডাকাবে। এর মধ্যেই ঝিমুনি নেমে গেছে রাস্তা ঘাটে। চওড়া রাস্তায় লোকজনের সংখ্যা ক্রমশ কম। কেন এসেছিলাম এখানে আমি? সিদ্ধার্থকে খুঁজতে? কেন কদিন ধরে বারবার ওর কথাই ভেবে মরছি? জি পি ও-র দিকে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। বাসস্টপে তিনটে ছেলে আমাকে দেখে কী যেন বলাবলি করছে। দুজন জোরে হেসে উঠল। ওরা কি সিদ্ধার্থর সঙ্গে আমাকে দেখেছে কোনওদিন? ধ্যাৎতেরি, কী সিদ্ধার্থ ঢুকে পড়ল মাথায়? ভাবতে হলে নীলাঞ্জন তো...। তিন সপ্তাহ পর পর বাড়ি যাইনি। এ সপ্তাহে যেতে হবে।

আমাদের হোস্টেলের সামনে এত ভিড় কেন? প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে সদর দরজার সামনে। গলির মুখের বাড়ি দুটো থেকে অনেক মুখ উঁকিঝুঁকি মারছে ওদিকে। হলুদ বাড়ির ধ্যাবড়া সিঁদুর পরা বেঁটে বউটা আমাকে দেখে মুখে আঁচল চাপা দিল। আমাদের সঙ্গে কথা বলে না। দোকানটা ছেড়ে কালো মুদিটা বেরিয়ে এসেছে লুঙ্গি গেঞ্জি পরেই। দরজার ঠিক সামনেই একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সির চারপাশে একদল ছেলের জটলা। ট্যাক্সি ড্রাইভার হাত পা ছুড়ে কী বলছে।

কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেতরে কোনও বিপদ আপদ হয়নি তো? আরেকটু এগোতেই পাঁচিলের ওপার থেকে বড়দির গলা ছিটকে এল,—'এটা ভদ্র মেয়েদের হোস্টেল। ছেনালপনা এখানে চলবে না।'

একটা মুখচেনা ছেলে, বোধ হয় পাড়ারই, টিটকিরি ছুড়ল,—'শালা মেয়েছেলেদের মেস, তার আবার এক নম্বর, দু নম্বর।'

—'আইন করে এইসব প্রাইভেট হোস্টেলগুলো তুলে দেওয়া উচিত।'

ঘটনাটা কী? মাথা নিচু করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকেছি। টের পাচ্ছি বেশ কয়েকটা কৌতূহলী চোখ আমার শরীরে গেঁথে গেছে। বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল। কী এমন হয়েছে...? বাঁদিকে অফিসঘরের দরজা জানলায় মেয়েদের ভিড়। ব্রততী, কৃষ্ণা, বুলবুল, মন্দিরা, বন্দনাদি, মধুছন্দা। বউদিদের ঘরে তামিল মেয়েটা ফড়ফড় করে শর্বরীকে কী বোঝাচ্ছে। পেছনের জানলায় কার্তিক জয়রাম। বড়দি আবার চিৎকার করল,—'ডাকি ড্রাইভারকে ভেতরে? কাপড়টা খুলে নিক তোর?'

কাকে বলছে এভাবে? এত বিশ্রী ভাষায়? মহিলার মুখ এমনিতেই আলগা ধরনের। তবে এমন অশ্রাব্য গালিগালাজ আগে তো কখনও শুনিনি! মেয়েরা ছেলেদের থেকেও বেশি মুখ খারাপ করতে

পারে। গোড়ালি উঁচু করেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সামনে দাঁড়ানো ব্রততীর পিঠে হাত রাখলাম,—'কী হয়েছে গো?'

—'কেলো কেস মাইরি।' ব্রততীর চোখ ভয়ানক উত্তেজিত,—'মাল একেবারে কট। রেড হ্যান্ডেড।'

—'কে?'

—'কাকলি!'

—'কাকলি মানে নতুন মেয়েটা! গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে এল।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই। পনেরো দিনেই বড়দিকে লাট খাইয়ে ছেড়েছে। দিনের মধ্যে কত লোক যে ফোন করছে ওকে। সবগুলোই নাকি ওর হাজব্যান্ড।'

—'তাইই? আজ কী হয়েছে?'

—'আরও কেলেঙ্কারি। বিকেল থেকে কোন এক চিড়িয়ার সঙ্গে ওই ট্যাক্সিতে করে ঘণ্টা তিনেক উড়েছে। গঙ্গার ধার, ভিক্টোরিয়া, আরও কোথায় কোথায় যেন। তারপর দিদিমণিকে এখানে নামিয়ে দিয়ে মাল সোজা নিউমার্কেটে। সেখানে ড্রাইভারকে দু মিনিট দাঁড়াতে বলে পাখি ভ্যানিশ। ড্রাইভারটাও হাড়ে খচ্চর। সোজা এখানে এসে হল্লা শুরু করেছে। এখুনি তার ভাড়া মেটাতে হবে।'

ব্রততীর সঙ্গিনী মধুছন্দা ফিরে তাকাল,—'এত খিস্তি খাচ্ছে তবু একটা জবাব নেই মেয়েটার। গোরু চোরের মতো ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো।'

বাইরে ড্রাইভারের চিৎকার,—'কী হল? ভাড়াটা মিটিয়ে দিন।'

ভেতরে ছোড়দির গলা,—'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। টাকা বার করো।'

মেয়েটা কিছু বলল? বোঝা গেল না।

—'নেই বললে হবে কেন? ফুর্তি করার সময় মনে ছিল না?' একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল ভেতরে।

—'কাঁদলেই কি সব চুকে যাবে নাকি? বিরাশি টাকা উঠেছে। বার কর। নয় বালা জোড়া খোল।'

—'ঠিক বলেছ দিদি। বালা দুটো তোমার কাছে জমা রাখো। আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি।'

জয়রাম বুঝি টাকা নিয়েই বেরিয়ে গেল বাইরে। সমস্বরে ছেলেরা কী বলছে। কোনও কথাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। কর্কশ কিছু পুরুষ কণ্ঠের চেঁচামেচি শুধু। ওর মধ্যে হয়তো ওই লোকটাও আছে! চন্দনার ননদাই। কাল তা হলে দেখতে হবে না। গোটা রাস্তা আমার জীবনটা নরক করে ছাড়বে। মেয়েটাই বা কী? দেখে কিছুই বোঝা যায়নি। কালো, নরম, শান্ত চেহারা, মুখটা দেবী প্রতিমার মতো।

জয়রাম দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করে দিল। ছোড়দি কাকে ফোন করছে। বোধ হয় বুড়ো উকিলবাবুকে।—'হ্যাঁ দাদা, আসতে হবে আপনাকে একবার। আজকেই। হ্যাঁ, একটা ফালতু মেয়ে...'

মেয়েরা অফিস ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমিও দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আলমারির কোণে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে কাকলি। দু হাতে মুখ ঢাকা। সেদিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বড়দি চেয়ারে বসল।

—'এই মেয়ে, এ লাইনে কদ্দিন?'

কাকলি ডুকরে উঠল।

—'কেঁদে আমাকে গলানো যায় না। ও সব খানকিপনা আমি অনেক দেখেছি। এই ছোট, ওর লোকাল গার্জেনের নামটা বার কর তো। মাস পোহালেই দূর করে দিতে হবে।'

ছোড়দি চকোলেট রঙের ঢাউস খাতাটা বার করেছে। বুলবুল আচমকা ফুট কেটে উঠল,—'ও সব গার্জেন টার্জেন ঘাঁটা কি ঠিক হবে? তা হলে তো অনেকেই...'

বড়দি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকিয়েছে,—'কী বলতে চাও তুমি? জেনেশুনে একটা বেশ্যাকে থাকতে দেব?'

—'সে যেন আর দ্যান না!' মন্দিরাদিও ঝাঁপিয়ে পড়েছে,—'আমাদের ঘরেই তো একটা স্যাম্পেল রয়েছে।'

—'দেখুন, না জেনে কারুর সম্বন্ধে কথা বলবেন না।'

—'না জেনে বলি না। এত বছর ধরে এখানে কি চোখ বুঁজে আছি? কিছুই নজরে আসে না। সকাল

হলেই হোস্টেলের সামনে গাড়ি। পিপপিপ প্যাপপ্যাপ, হি হি হাসি, হো হো হাসি...'

ছোড়দি কথাগুলো কানেই তুলল না। খাতা খুলে উঁচু করে ধরেছে,—'পেয়েছি দিদি। এই তো, গার্জেনের নাম বিষ্ণুদাস মাইতি, রিলেশনশিপ জ্যাঠামশাই, ঠিকানা...'

—'আমিও তা হলে বলি কটা। লোকাল গার্জেন বার করুন।' মন্দিরাদি কোমর বেঁধে এগিয়ে গেল। এই মহিলা খেপে গেলে থামিয়ে রাখা মুশকিল।

—'সবার এত দরদ উপচে পড়ছে কেন বুঝতে পারছি না।' দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য ছুড়ে দিল বন্দনাদি,—'এটা বেশ্যাবাড়ি নয়। যে এই ধরনের কাজ করবে তাকে হোস্টেল ছাড়তে হবে ব্যস।'

—'ঠিক আছে, উকিলবাবু আসুক। আজ ফয়সালা হয়ে যাক।'

মন্দিরাদিদের দেখাদেখি অনেকেই কথা ছুড়তে শুরু করেছে। ক্যাচক্যাচ কিচমিচ চারিদিকে। কাকলি একভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য! একটাও উত্তর দিল না! ওর কি কিছুই বলার নেই! সত্যিই তা হলে নিজের অপরাধ...

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠছি। ভাল লাগছে না। এই ছ'মাসে অনেকরকম কাণ্ডকারখানা দেখেছি এখানে। এরকম নারকীয় পরিস্থিতি আজ প্রথম। তা হলে কি আমার ছোটমাসির বাড়িতে থাকাটাই উচিত ছিল? দাদারা শুনলে কী ভাববে?

মন্দিরাদি পেছন থেকে গজ গজ করতে করতে আসছে,—'দেখলি তো রাই, সত্যি কথা কেউ কানে তুলতে চায় না। পয়সা খাওয়ালে কী না হয়। তোদের বউদির কথা কাকপক্ষীও জানে। ওই মারুতিঅলা কে হয় ওর? বেহালার বাড়িতে স্বামী রয়েছে, দুটো ছেলেমেয়ে, বুড়ি শাশুড়ি। সব ফেলে এখানে পড়ে থাকে কেন? এটা নোংরামি নয়? নাকি লোকটা দুহাতে পয়সা ছড়ায় বলে...'

ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়লাম,—'আপনার কি মনে হয় সত্যি কাকলি নির্দোষ?'

—'দোষগুণের কথা হচ্ছে না। হতেই পারে মেয়েটা বদ। কিন্তু সবক্ষেত্রে একটাই প্রিন্সিপল থাকা দরকার। একেক জনের বেলায় একেক রকম...নিজেরা কী? যারা শাস্তি দিচ্ছে? তারা কী করে জানি না? দুই ধুমসি মাগি মিলে...'

—'থাক মন্দিরাদি, চুপ করুন।' কানে হাত চাপা দিলাম।

—'কেন চুপ করব? নীচের ব্রততীর দলটা কী? মেয়েরা মেয়েরা ছিঃ...'

বারান্দায় উঠে গেলাম। মন্দিরাদিও উঠে এসেছে,—'একবার একটা মেয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল, জানিস। সীতানাথ বলে এক ছোকরা চাকরের সঙ্গে...কী ঘেন্না...শেষে কী হল বল তো? সীতানাথের চাকরি গেল। আর মেয়েটা শুধু টাকা দিয়েই রেহাই পেল না, বড়দি ডাকলেই গিয়ে তার বিছানায় শুতে হত।'

মন্দিরাদিকে আর থামানো যাবে না। এখন রাত অবধি গোটা হোস্টেলের কেচ্ছা গাইবে। ঝগড়া করার সময় ভদ্রমহিলার গোল মুখটা বিকৃত হয়ে যায়। যৌবনকালে মনে হয় সুশ্রী ছিল। শরীর এখন ভারীর দিকে। তবু যখন সোনালি ফ্রেমের চশমা পরে অফিসে বেরোয়, দেখতে ভালই লাগে। এখানে থাকতে থাকতেই কি মুখরা হয়ে গেছে? নাকি ভাইদের গলাধাক্কা খাওয়ার পর থেকে এরকম? ঘরের কারুর সঙ্গে বাক্যালাপ নেই। আমি ছাড়া। বন্দনাদি না, হিরণদি না, শুভ্রা তো নয়ই। বেচারি কষ্ট করে যে ভাইদের মানুষ করল, বিয়ে দিল, তারা সবাই যে যার সংসার পেতে সুখী এখন। দিদিটার আর বিয়ে করাই হল না। বন্দনাদির দুর্ভাগ্যের তো পরিসীমা নেই। অল্প বয়সের বিধবা, সেই জিয়াগঞ্জ না কোথায় বাড়ি। একটা যদি ছেলেপুলেও থাকত বন্দনাদির। সর্বত্র ঠোক্কর খেতে খেতে শেষ আশ্রয় এই হোস্টেল। সম্বল প্রাইমারি স্কুলের টিচারিটা। ইদানীং মঞ্জুদির মতো বন্দনাদিকেও শুচিবায়ুতে ধরছে। ঘন্টার পর ঘন্টা বাথরুমে বসে সাবান ঘসে। জলে জলে হাত পা ভর্তি হাজা। ছুটির দিনে বসে বসে নিজের সব কৌটোবাটা ধোয়। খুচরো পয়সা পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখে সাবান জলে। একদিন মন্দিরাদি টিপ্পনী কেটেছিল,—'ওরে রাই, তোর মাইনের নোটগুলো ধোপার বাড়ি থেকে কাচিয়ে আনিস তো?' শুনে সে কী গালাগালির ফোয়ারা বন্দনাদির ঠোঁটে। ভাবলে অবাক লাগে, দুজনেরই এত সমস্যা, দুঃখ, তবু পরস্পর মুখোমুখি হলেই ঠোকাঠুকি। রাগী বেড়ালের মতো এ ওর দিকে তাকিয়ে গরগর করতে থাকে।

হিরণদি সেজেগুজে ডিউটিতে বেরোচ্ছে। নার্সিংহোমে পৌঁছেই তো মুখের রং সব তুলে ফেলতে হবে। তবু কেন এত সাজে! শুধু এইটুকু রাস্তা যাওয়ার জন্য?

আমাকে দেখে হিরণদি দাঁড়াল,—'নীচের ঝামেলা মিটেছে? যত সব।'

হাসার চেষ্টা করলাম,—'তুমি আজ নাইট করছ যে? ইভনিং ছিল না?'

—'আর বলিস না। দুজন জুনিয়ার নার্স ছুটি নিয়েছে। এদিকে নার্সিংহোম একেবারে রুগিতে রুগিতে থই থই। আমি অবশ্য বলে দিয়েছি, এ সপ্তাহটাই, পরের উইকে কোনও ডিউটি নেব না।'

কথা বলতে বলতে নেমে যাচ্ছে হিরণদি। কাঁকনদের ঘরে উঁকি দিলাম। মঞ্জুদি নেই কেন? এমন একটা সরস দিনে? নির্ঘাত কালীঘাটে গেছে। কাঁকন কপালে হাত রেখে শুয়ে।

—'কী রে এত কাণ্ড হয়ে গেল? নীচে নামিসনি যে বড়?'

কাঁকন চোখ খুলে আবার বন্ধ করল।

—'কী হয়েছে তোর? শরীর খারাপ?'

—'উহুঁ।'

—'নীচের ঘটনা শুনেছিস? কাকলি বলে ওই মেয়েটা...'

—'বাদ দে ও সব কথা। ওতে আমার ইন্টারেস্ট নেই।'

কী হয়েছে কাঁকনের। মেয়েটা তো এরকম নয়। সব ঝামেলার ভেতর আগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেন পৃথিবীটাকে উদ্ধারের দায় ওর একার। আমি যখন প্রথম আসি, ও নিজে থেকে এগিয়ে এসেছিল কাছে। আমার ভয়, সংকোচ কাটিয়ে উঠতে কত সাহায্য করেছে সে সময়। শুধু বন্ধু নয়, ও তখন ছিল আমার মা, দিদি, বোন সব কিছু।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম,—'নিশ্চয়ই তোর কিছু হয়েছে। বল আমাকে।'

—'বলছি তো কিছু হয়নি। একতলার ও সব ব্যাপার আমার ভাল লাগে না।'

—'ভাল তো আমারও লাগে না।' একটু থামলাম,—'তবে কী মনে হয় জানিস। আজকের ঘটনাটা কাকলির ইচ্ছাকৃত নয়। মেয়েটাকে দেখে ওরকম মনে হয় না।'

কাঁকন শুনেও শুনল না,—'তোর আজ দেরি হল?'

ও যেন আমার বক্তব্য শুনবেই না ঠিক করেছে। উলটো প্রশ্ন করলাম,—'তুই আজ এত তাড়াতাড়ি যে।'

...'এমনিই। ভাল লাগল না রিহার্সালে যেতে।'

নিজের ঘরে এলাম। দমকা হাওয়ায় জারুল গাছের পাতাগুলো ঝমঝম নাচছে। ফুলে ফুলে ভরে গেছে ডালগুলো। এগিয়ে গিয়ে জানলার পর্দা নামিয়ে দিলাম। কাপড় বদলাব। নীচের তলার গণ্ডগোল থেমে এসেছে। উকিলবাবু এসে গেছে হয়তো। রান্নাঘরে কাঁসার বাসন আছড়ে পড়ল। পাশের বাড়ির টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল শুরু হয়েছে। আজ আমাদের নীচের টিভি বন্ধ। কুঁচিটা সবে কোমর থেকে খুলেছি, আচমকা কাঁধে কাঁকনের হাত,...'ছাদে চল। তোর সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

সাত

আজ আর রাতে ঘুম আসবে না বোধ হয়। মাথার ভেতর কেউ সহস্র ধুনি জ্বালিয়ে দিয়েছে। শরীরের কোষে কোষে অসহ্য জ্বালা। আগেও অনেক রাত জেগেছি। শিবপুরে, কৃষ্ণনগরে। তখন কষ্ট ছিল অন্যরকম। আজ এরা কারা ঢুকে পড়েছে আমার মাথায়? কী করতাম আমি, যদি রাই না হয়ে আমি কাঁকন হতাম? কিংবা কাকলি? কিংবা মঞ্জুদি? বন্দনাদি? মন্দিরাদি? আপনাদের কাছে এমন কোনও ছক আছে কি যা মেনে চললে জীবনে শুধুই নিশ্চিন্ত সুখ আসতে থাকে? এমন কোনও নিয়ম আছে, যেগুলো ভাঙলেই শুধু দুঃখ? এই যে মঞ্জুদি, যার কথা শুনলে ঘরে পোষা কুকুর বেড়ালের কথা মনে পড়ে যায়, একটু আলগা সমবেদনাও জাগে, সেও তো একটা পুরোপুরি মানুষ! আমার আপনার মতনই! হয়তো নিজের সম্বন্ধে সচেতন নয়, তবু তো দেখেছি কখনও কখনও মাঝরাতে উঠে বারান্দার থামের পাশে বসে একা একা কাঁদে। অবিরাম। নিঃশব্দে। হয়তো নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য কাঁদে। হয়তো এই বিরাট

পৃথিবীতে নিজেকে খুঁজতে গিয়ে কাঁদে।

কিংবা কাকলির কথাই ধরুন না। মেয়েটা যে সারা সন্ধে একটা লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে কাটাল, সেও তো অপমানের ঝুঁকি নিয়েই? নয় কি? তার কাণ্ডকারখানা দেখে আপনি নাক কুঁচকোতে পারেন কিন্তু কাকলির তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ কাকলির অসহায়তাটা আপনার নাক কুঁচকোনোর থেকে অনেক বেশি তীব্র। খাওয়া দাওয়ার পর মন্দিরাদির কাছে ওর গল্প শুনে আমার গা ছমছম করে উঠেছিল। এমনও হয়? জানেন মেয়েটাকে প্রথম ধর্ষণ করেছিল ওর জাড়তুতো দাদা। ভুরু বেঁকাচ্ছেন কেন? ঘটনাটা সত্যি। তখন নাকি ও পনেরো বছরের। অবশ্য ব্যাপারটাকে ঠিক ধর্ষণ বলা যায় না। কারণ কাকলিও নিষিদ্ধ আনন্দটাকে ভোগ করেছিল তারিয়ে তারিয়ে। বোধহীন জন্তুর মতো। জাড়তুতো দাদা থেকে হাত বদল হয়ে পিসতুতো ভাই। আবার জাড়তুতো দাদা। তা নিষিদ্ধ প্রেম আর আগুনের ধোঁয়া কি চেপে রাখা যায়! ধরা পড়ল জেঠিমার হাতে। ও, আপনাদের তো বলাই হয়নি। কাকলির মা পালিয়ে গিয়েছিল ওর খুব ছেলেবেলায়, বাবা মারা যাওয়ার পরপরই, এক পাড়াতুতো কাকার সঙ্গে। জেঠিমার গলাধাক্কা খেয়ে কাকলি প্রথমে গিয়েছিল তার সেই মায়ের কাছে। সেখানে মায়ের একগাদা ছেলেমেয়ে। আর অভাব, অশান্তি। তবু জায়গা একটু জুটেছিল। হলে কী হয়, সৎবাবাটি দৃষ্টি দিলেন। মায়ের সংসার থেকে তাড়া খেয়ে আরেক জেঠার দরজায়। লেখাপড়া বেশি দূর শেখেনি। তবে সেলাই-এর ডিপ্লোমা ছিল। তারই জোরে আর জেঠার কৃপায় বহু কষ্টে একটা চাকরি জুটিয়েছে বেহালার দিকে কোন সেলাই স্কুলে। রোজগার খুব বেশি না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মেয়েটা চাকরির সঙ্গে সঙ্গে রোজগারের সবথেকে সহজ রাস্তাটাও বেছে নিয়েছে। মন্দিরাদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—'মেয়েটা আপনাকে নিজে এ সব কথা বলেছে?'

—'বলেছে রে। বলেছে আর কেঁদেছে।'

মন্দিরাদিকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে পারিনি। এই কি সেই মন্দিরাদি যে মেয়েদের নিয়ে মুখরোচক আলোচনা করতে পারলে আর কিছু চায় না। কাকলিকে নাকি বুঝিয়েওছে! বলেছে, ভালভাবে বাঁচার মতো ব্যবস্থা করে দেবে। নানান মহিলা সমিতি-টমিতির সঙ্গে মন্দিরাদির জানাশুনো আছে। ভাল হলেই ভাল। কিন্তু আমার মনে যে একটা সন্দেহ খচখচ করেই যাচ্ছে। ও কি পারবে সঠিক জায়গায় ফিরতে? আপনার কী মনে হয়? আমি হলে কী করতাম? ভাবতে গেলে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। নাহ্, কাকলির জায়গায় নিজেকে বসাতে পারছি না। আমার আর কাকলির সমস্যা এক নয়। আমরা দুজনে এসেছি সমাজের একই অবস্থার দুটো আলাদা বৃত্ত থেকে। আমাদের পারিবারিক সম্পর্কগুলো অনেক বেশি ট্র্যাডিশনাল। কাকলিদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু মূল্যবোধ কোনও কারণে আলগা হয়ে গেছে।

একটু মুখেচোখে জল দেওয়া দরকার। বিছানায় উঠে বসেছি। সামনের মাসে মাইনে পেলে মশারিটা বদলাতে হবে। একদম হাওয়া ঢোকে না। ভাল গরম পড়ে গেছে। ফ্যানটা মন্দিরাদি আর বন্দনাদির মাঝখানে; এখান থেকে বেশ খানিক তফাতে। দুই সিনিয়ার মহিলা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বন্দনাদির শোওয়া ভারী বিশ্রী। কতখানি কাপড় উঠে গেছে। ডেকে তুলব? থাক। মন্দিরাদি জোরে জোরে নাক ডাকাচ্ছে। এই মহিলাকে আজকে বুঝে উঠতে পারিনি। ওপাশে হিরণদি আর শুভ্রার বিছানা খালি। শুভ্রা রাতে ফেরেনি। জানলার একেবারে সোজাসুজি বাইরের লাইটপোস্টটা। শুভ্রার বেডকভার দখল করে এক ঝাঁক আলো ছড়িয়ে পড়তে চাইছে গোটা ঘরে। আস্তে ছিটকিনি নামালাম। পাশে পর পর তিনটে ঘরের দরজা বন্ধ। কাঁকনও কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

অন্ধকার ছাদে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কাঁকন দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। গাঢ় নীল আকাশে তখন তারা থই থই। কাঁকনের নীল শাড়ির জরিপাড় চিক চিক করছিল অন্ধকারে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হলাম আমি,—'কীরে কী বলবি বল।'

ও বুড়ো আঙুলে কপাল চুলকোল। আবার চুপ। আমরা যেদিকটায় দাঁড়িয়ে ঠিক তার সামনেই ভাঙা প্রাসাদটা। অন্ধকার আলো করে ফুটে আছে অমলতাস। অনেক ফুলের গন্ধমাখা মনকেমন করা বাতাস কাঁপছে মৃদু। নীচে খেতে যাওয়ার ফার্স্ট বেল পড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁকন আমার হাতদুটো খামচে ধরল আচমকা,—'আমি কি ভুল করছি রাই?'

—'কী করেছিস?'

—'জানি না রে। কী যে হয়ে গেল...' কাঁকনের মুখ আবার তখন ভাঙা বাড়িটার দিকে,—'আবীরের সঙ্গে আমি...বিশ্বাস কর, আমার খুব ভাল লেগেছে...'

—'কোন আবীর? তোদের সঙ্গে যে নাটক করে?'

কাঁকন স্থির।

—'কী করেছিস আবীরের সঙ্গে।'

কাঁকন যেন এখানে নেই। কিছুই শুনছে না। দেখছে না।

—'আমি মণীশকে ভালবাসি রাই।'

—'জানি তো।'

কাঁকন কার্নিশে কনুই রেখে ঝুঁকল। সিগারেট ধরাল অন্যমনস্কভাবে।

—'তুই তো জানিস, আমি অনেক ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করি। জাস্ট মেলামেশা। সেই ছেলেবেলা থেকেই। নাটক করতে করতে কতরকম মানুষের সংস্পর্শে এসেছি...কোনওদিন কিছু মনে হয়নি...তা ছাড়া সেরকম সম্পর্কও তো গড়ে ওঠেনি কারুর সঙ্গে...'

—'কী হয়েছে সব খুলে বল তো।'

কাঁকন এক বুক ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল নারকেল গাছগুলোর দিকে,—'তুই তো জানিস আমাদের বাড়িটাই অভিনয়পাগল বাড়ি। বাবা, দাদা, জেঠু সকলেই নাটক ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে সে নেশা আমাকেও ধরেছিল। বালুরঘাটে বাবাদের ক্লাবে প্রথম নাটক করি। একটা বাচ্চা মেয়ের রোল...

—'এ সব কথা তো শুনেছি।'

—'তবু আবার শোন, আমার বলতে ইচ্ছা করছে।'

যেন আমি নয়, নিজেরই মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছিল কাঁকন। মেয়েটা বড় দুঃখী। অথচ গুণ কত। লেখাপড়ায় ভাল। দারুণ অভিনয় করে, ভাল নাচে। কবিতা লেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। এক দিন ওর ডায়েরি আমি দেখেছি।

—'তোকে বালুরঘাটের একটা ঘটনা বলা হয়নি।' কাঁকন মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া চুল সরাল,—'আমার প্রথম সেক্সুয়াল অভিজ্ঞতার কথা...তখন বয়স বারো কি তেরো, একদিন জেঠুদের ক্লাবের পেছনে, সুজনকাকু জোর করে চুমু খেয়েছিল আমাকে, জড়িয়ে ধরেছিল।'

—'সুজনকাকুটা কে?'

—'নতুন কাকুর বন্ধু। সুজনকাকুর মেয়ে আমার ছোটবোনের সঙ্গে পড়ত। বিশ্বাস কর রাই, একটুও ভাল লাগেনি। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শেষে আমার ফ্রকের বোতাম খুলতে যেতে কেঁদে ফেলেছিলাম ভ্যাঁ করে।'

—'লোকটা মহা পাজি তো।'

—'পাজি কি ভাল জানি না। শুধু মনে আছে ভয় পেয়েছিলাম। অন্য কোনও ফিলিংসই আসেনি। সুজনকাকু আমার কান্না দেখে বলেছিল,—'আজকের কথা কাউকে বোলো না কঙ্কনা, তা হলে লোক তোমারই নিন্দে করবে।'

—'তাই তো হয়।' আমার ভুরু কুঁচকে গেছে তখন,—'ছেলেরা ভোগ করে মেয়েদের মুখ পোড়ে।'

কাঁকন ঠোঁট কামড়ে মাথা নাড়ল,...'সেই প্রথম শরীরে কোনও পুরুষের স্পর্শ। জানিস তারপর সুজনকাকু সুযোগ পেলেই ডাকত আমাকে। ছুটে পালাতাম, কী যে আতঙ্ক তখন...'

—'তারপর?'

—'স্কুল পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই জেনে গেলাম। শিখে গেলাম। নিজের শরীর সম্পর্কে কনশাস হলাম বলতে পারিস। আর সুজনকাকুকে দেখে ভয় করে না। লজ্জা লাগে। লজ্জা, লজ্জা...'

'লজ্জা' শব্দটা নিয়ে নিজের মনে খেলতে আরম্ভ করল কাঁকন, যেন কোনও নাটকের সংলাপ। সমস্ত শরীর দিয়ে বুঝি 'লজ্জা'টাকে নানাভাবে অনুভব করতে চায়। আমি হাঁটতে হাঁটতে ছাদের অন্য কোণে চলে গেলাম।

মণীশের সঙ্গে বিয়েটা কাঁকনের জীবনের সবথেকে গভীর লজ্জা। বালুরঘাট থেকে এম.এ. পড়তে কলকাতায় এসেছে। কবি মণীশ সান্যালের সঙ্গে তখনই আলাপ, কফি হাউসে। মণীশের তখন ওঠার

সময়। চুটিয়ে কবিতা লিখছে অজস্র ম্যাগাজিনে। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, এলোমেলো চুল। নেরুদা, রিলকে সবসময় ঠোঁটে। কাঁকনের উপায় কী ছিল প্রেমে পড়া ছাড়া? মণীশের হাত ধরে কাঁকন তখন উড়ছে আর উড়ছে। একপাল অনুরাগিণীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে মণীশকে, সেই আনন্দটাকেই চাখছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বছর না ঘুরতে মণীশ চাকরি পেল। এভরি ইন্ডিয়ার সেলস এক্সিকিউটিভ। তার মাস তিনেকের মধ্যে বিয়ে হই হই করে। তারপরই শুরু হল...।

ফুলশয্যার রাতে কাঁকন ঘরে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মণীশ। এখনও বলতে গেলে কাঁকন উত্তেজিত হয়ে পড়ে,... 'ভাবতে পারিস রাই, ঘুমিয়ে পড়ল। ফুলশয্যার রাতে। টানা একবছর চুটিয়ে প্রেম করার পর...তারপর ভাবলাম সারাদিন ধকল গেছে...আহা ঘুমোক বেচারা। কালকেই তো হনিমুনে যাব দার্জিলিং।'

কাঁকন জানত না দার্জিলিং কী ভয়ানক সংবাদ নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। তখন সবে শীতের শুরু।

...'পাহাড় ভেঙে ঠাণ্ডা গড়িয়ে আসছে। সন্ধে হতেই মণীশ হুইস্কি খেতে শুরু করল। আমিও অল্প অল্প। ভেতরে ভেতরে ভয়ানক উত্তেজনা। কিছুটা মনে। অনেকটাই শরীরে। ওর কাঁধে মাথা রেখে আধশোয়া আমি। চার-পাঁচ পেগ খাওয়ার পরে মণীশ প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরল আমাকে। পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। কী ভাল যে লাগছিল রাই। মনে হচ্ছিল আমি বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি। কতদিন ধরে এই দিনটার প্রতীক্ষায় ছিলাম। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইছি। আরও নাও আমাকে। আরও। অনেকক্ষণ আদর করার পর মণীশ আচমকা উঠে দাঁড়াল। টলছে। দুহাতে মুখ ঢেকে বলল,...শুয়ে পড়ো কাঁকন, আমি আজ সারারাত জাগব।

আমি বলেছিলাম,—'আজ তো জেগে থাকারই রাত।'

মণীশ উত্তর দেয়নি। জানলা খুলে বাইরের ঘন কুয়াশার দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। তারপর আবার হুইস্কি ঢেলেছিল গ্লাসে। আবার। আবার। বারণ করেছিলাম। শোনেনি।

—তখন আমি নির্লজ্জের মতো শুধু চাইছি রে রাই। চাইছি। চাইছি। সম্পূর্ণ মাতাল হওয়ার পর ঘোলাটে চোখে আমাকে দেখল অনেকক্ষণ। দেখলই শুধু। তারপর বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল। কবিতা? আমি শুনিনি। আস্তে আস্তে রাগ হচ্ছে তখন। মনে মনে অপমানিতও হচ্ছি যেন। একসময় বিড়বিড় করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়ল মণীশ। আমি জেগে রইলাম। বহুক্ষণ। আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছিস নিশ্চয়ই। শুধু অপমান নয়, শরীর ভেঙে কী এক অজানা যন্ত্রণা তখন...।

ঘুম থেকে উঠে দেখি মণীশ নেই। গত রাত্রের অপমানটা যখন মনের ওপর আবার দখল নিচ্ছে, সে সময় ফিরল। কেমন বিধ্বস্ত। চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে বাথরুমে চলে গেল। তারপর হঠাৎই বেরিয়ে আমার কোলের ওপর পড়ে সে কী কান্না। প্রথমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তারপর পাগলের মতো,—বিশ্বাস করো। ভেবেছিলাম বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে...তোমার সর্বনাশ করে দিলাম...আমাকে মেরে ফেলো... আমার মরে যাওয়া উচিত।—এত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, সে মুহূর্তেও বুঝতে পারিনি মণীশ ইম্পোটেন্ট। অনেক পরে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল। ডানা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলাম।'

আবার সিগারেট ধরিয়েছে কাঁকন। প্রথম ধাক্কাটার পর মেয়েটা একটু একটু করে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করেছিল। সান্ত্বনা দিয়েছে মণীশকে। বড় স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গেছে।

—'বিশ্বাস কর রাই, আমি নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলাম। শারীরিক প্রয়োজনটাই কি সব? আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি, এটাই কি বড় কথা নয়? মণীশকেও এ কথাই বুঝিয়েছি বার বার। কিন্তু ও যেন ক্রমশ কেমন হয়ে গেল। যেদিন জানতে পারল ওর অসুখটা ভাল হওয়ার নয়, সেদিন থেকে কেমন হিংস্র হয়ে উঠল। আমার পাশে শোয় না, আমাকে সহ্য করতে পারে না। বিশ্রী ব্যবহার করে। ও শুধু নিজের কথাই ভাবত তখন। আমার কথা কোনও সময় ভাবেনি। আমিও যে রক্তমাংসের মানুষ...আমিও যে কী ভয়ানক শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে...'

সব কিছু ভুলে থাকতে কাঁকন নতুন করে ডুবে গেল নাটকে। বাইরের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। পুরনো গ্রুপে জয়েন করল। তারপর যা হয়। শেষের দিকে মণীশ নাকি প্রচণ্ড মারধোরও শুরু করেছিল।

—'তুই ভাবতে পারবি না রাই আমাদের স্বপ্নের সংসারটা কীভাবে একটু একটু করে নরক হয়ে

গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ধৈর্য হারালে তার পরিণাম যে কী বিষাক্ত...। শেষে দুজনেই একদিন একসঙ্গে আলিপুর কোর্টে পিটিশন দিলাম। মিউচুয়াল সেপারেশনের।'

কাঁকন থুতনিতে চিবুক রেখে দাঁড়িয়েই ছিল। ওর পিঠে হাত রেখেছিলাম,—'চল, খেয়ে আসি।'

—'তুই যা, আমার ভাল লাগছে না।'

—'পাগলামি করিস না।'

—'তুই বুঝতে পারছিস না রাই আমি যেন...বিশ্বাস কর, আবীরের সামনে মনে হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই খিধেটাই বুঝি ঘাপটি মেরে বসেছিল আমার মধ্যে। হয়তো বা সুজনকাকুর সময় থেকে...হয়তো বা মণীশকে বিয়ে করার পর থেকে...আমার কেন এত ভাল লাগল রাই?'

—'লাগতেই পারে। এতে অন্যায় কী আছে? কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা কোনও নিয়ম মেনে চলে না।'

নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠেছিলাম। আমিই কি বলছি কথাগুলো? আমি, রাইকিশোরী?

কাঁকন বাচ্চা মেয়ের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে চাইছে। পারছে না।

ওর চুলে হাত বোলালাম। এই প্রথম আমি কাউকে সান্ত্বনা দিচ্ছি,—'তোকে আবীর ভালবাসে?'

—'কে জানে। তবে বিয়ে করতে চায়। আমাকেই।'

—'তা হলে এত ভাবছিস কেন? আরেকবার দ্যাখ না নতুন করে...'

—'বুঝতে পারছি না কী করি।' কাঁকন শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলল,—'আবীরের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার পর ভীষণ অপরাধী লাগছে রে নিজেকে।

যেন একটা চরম নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছি। কেন এমন হচ্ছে? কেন মণীশের কাছে করা প্রতিজ্ঞাটা রাখতে পারলাম না?'

—'বোকার মতো কথা বলিস না।' আমি নয়, যেন অন্য কেউ আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছিল কথাগুলো,—'মণীশ এর মধ্যে আসছে কেন? হোয়েন আ চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজড, ইট ইজ ক্লোজড ফর এভার।'

—'সত্যি সত্যি কি ক্লোজড করা যায়?'

—'কেন যাবে না? আমি করছি না? ভুলে যাচ্ছিস কেন তুই আর মণীশের বউ নোস। তা ছাড়া মণীশ তোকে ঠকিয়েছিল। তোর কাছে গোপন করে...'

কাঁকন মাথা নাড়ল,—'হয়তো তুই ঠিকই বলছিস।'

—'বলছি। বলছি।'

কাঁকন আবার ভাবছে,—'তা হলে বলছিস আবীর আমাকে ভালবাসে?'

হেসে ফেললাম,—'এ কথা কখন বললাম? ভালবাসে কি না বুঝবি তো তুই।'

—'রাই, একটা সত্যি কথা বলবি? তোর সেই বদমাইশ স্বামীটার কথা ভাবিস তুই?'

—'কেন?'

—'তার সঙ্গে তো একটা শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল, তার থেকে কোনওদিন কোনও ভালবাসা গ্রো করেনি?'

কাঁকন কি আমাকে পাগল করে দেবে? কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছিল। আবীর কিংবা মণীশের সঙ্গে অনিমেষের কখ্খনও তুলনা করা যায় না। নিজেকে দিয়ে কাঁকন আমার কথা বুঝতেই পারবে না। যেমন আমি কাকলির কথা বুঝতে পারি না।

কাঁকন জিজ্ঞাসা করেছিল,—'উত্তর দিলি না?'

—'কী উত্তর দেব বল। দুটো জন্তুর মধ্যে যে ফিজিকাল সম্পর্ক থাকে, আমাদেরও তাই ছিল। সেই মুহূর্তে হয়তো ভালও লাগত। তার বেশি নয়।'

অনিমেষের কথা ভাবতে গিয়ে আরেক জনের মুখ কেন ভেসে উঠছিল বার বার? সিদ্ধার্থ নয়। আরেক জন। নীলাঞ্জনকে দেখে কি আমার কোনওদিন...এভাবে তো ভেবে দেখিনি। নীলাঞ্জন আর আমি? এক বিছানায়? ধ্যুৎ, ভাবতেই পারি না। তবে কি সেই যে কলেজে পড়েছিলাম—রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়!—ও রকমও কি হয়? তা হলে কাঁকন আবীরের কাছে যায় কেন?

কলসির জল বাষ্প হতে হতে যেমন একসময় তলায় ঠেকে থাকে, কাঁকনেরও হয়তো তাই হয়েছে। আপনি কী বলেন? আমি ঠিক ভাবছি? কাঁকনের কাছে কোনটা সত্যি? মণীশের ভালবাসার স্মৃতি? না আবীরের বর্তমান...?

দূরে কোথাও একটা মাতাল হল্লা করছে। গাঁজাপার্কের চোলাইখানা বুঝি সারারাত খোলা থাকে। ক্রিশ্চিনটারও কী সব ঝামেলা চলছে ম্যাথুজকে নিয়ে। ডোমা ব্যাপারটা জানে। দু-একদিনের মধ্যে ম্যাথুজ চলে যাবে। এখন কীসের গণ্ডগোল! কী যে হচ্ছে চারদিকে। শার্লি বলে ওদের দেশে বিয়ের সময় একজোড়া লাভবার্ডস উপহার দেওয়া হয় নতুন দম্পতিকে। লাভবার্ডস বুঝছেন তো? সেই পাখিগুলো, যাদের জোড়ার একটা মরে গেলে অন্যটাও না খেয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যায়। ওরা হয়তো আশা করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও এরকম হবে। তা কি আর হয়? মানুষ কি পাখি?

মন্দিরাদির টাইমপিসের চোখ জ্বলছে। দুটো দশ। এভাবে সারারাত জেগে থাকব নাকি? এলোমেলো কথা ভেবে? দেখি এক-আধটা ক্যামপোজ ট্যামপোজ পাওয়া যায় নাকি। টিউবের সুইচ অন করলাম। মাথার ভেতর একটানা টাইপরাইটারের খটাখট, খটাখট। বহুকাল পর আজ রাত জাগছি আমি।

আট

অফিসে ঢুকতেই বদ্রি বলল,—'মেমসাব, সাবনে আপকো সালাম দিয়া থা।'

অফিস জুড়ে আজ দারুণ ব্যস্ততা। মালিকরা বোধ হয় ভোর না হতেই চলে এসেছে। কাল থেকে জোর ঝাড়পোঁছ চলছে। এরিয়া ম্যানেজার আসবে। এরিয়া ম্যানেজার মানে রজার দালভি, ব্যাঙ্গালোর মিলের ইস্টার্ন জোনের হর্তাকর্তা। মালহোত্রা ব্রাদার্সের মতো এদিককার অনেক এজেন্টদের প্রভু। মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠল। দালভির মতো সুপুরুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। স্মার্ট অ্যাথলেটদের মতো ফিগার, ছ ফুটের ওপর লম্বা, টকটকে গায়ের রং। গতবার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ছিল। প্রতিবার অফিসে ঢুকেই ইংরিজি ফিল্মের কায়দায় আমাকে বাও করে,—'হাউ'জ লাইফ ম্যাম?'

বদ্রিকে পি বি এক্স বোর্ডে বসিয়ে বড় সাহেবের ঘরের দিকে গেলাম। টু বাই টেন বোর্ড বদ্রি সুন্দর ম্যানেজ করতে পারে। আহা, ওর কেন প্রমোশন হয় না। অবশ্য আমার এই ছোট্ট বাক্সটাকে অফিসের সবাই চালাতে পারে। আমার মতো নির্বোধ মেয়েও একদিনে শিখেছিল।

ব্রাউন পালিশের দরজা আলগা করে ঠেললাম,—'মে আই কাম ইন স্যার?'

—'ইয়েস।'

ছোট সাহেবও বড় সাহেবের ঘরে বসে। আমাকে দেখেই ভিনোদ অভ্যাসবশে নিজের ঘড়ি দেখছে। একটু হতাশ হল মনে হয়। আজ আমি একেবারে পাঙচুয়াল। ঘরটাকে একটু আলাদাভাবে সাজানো হয়েছে। ক্যাবিনেটের মাথায় ফুলদানিতে গুচ্ছ গোলাপ। ফাইলগুলো নিখুঁতভাবে রাখা। ভোর থেকেই বোধ হয় এয়ার কুলার চলছে। ঘর জুড়ে পাহাড়ি ঠাণ্ডা।

বড়সাহেব হলুদ ফাইলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে,—'এখখুনি ভেতরের নোটটা তিন কপি করে টাইপ করে দাও তো। অ্যান্ড গেট ইউর কাউন্টার ক্লিনড। রজারের সঙ্গে লালওয়ানি আসবে। মিলের ওয়ান অফ দা ডাইরেক্টরস।'

—'রাইট স্যার।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, ভিনোদ ডাকল,—'লিসন, ওরা এলে ঘরে কোনও ফোন দেবেন না। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিসটার্বড।'

আবার ঘাড় নাড়লাম,—রাইট স্যার।'

সবে টাইপ শেষ করে কার্বন খুলছি, অফিসে হালকা গুঞ্জন। রজার ঢুকছে। সঙ্গে একটা বেঁটে মতন ধুতিপরা লোক। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছি সিট থেকে,—'মরনিং স্যার।'

চোখ থেকে নিজস্ব কায়দায় সানগ্লাস নামাল দালভি,—'ভেরি গুড মরনিং, মে আই মিট দা মালহোত্রাজ?'

হন্তদন্ত হয়ে কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি,—'দে আর ওয়েটিং ফর ইউ স্যার। প্লিজ কাম ইন স্যার, প্লিজ।' আমিও পুরো মেমসাহেবি কায়দায় ওদের রাস্তা দেখাচ্ছি। বদ্রি দৌড়ে গিয়ে বসের দরজা খুলে ধরেছে। আমার সাহেবরাও কেমন ছুটে আসছে দেখুন। ভিনোদ তো আমার থেকেও জোরে লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে। হিহি, হিহি, এমন মজা লাগছে। অমন প্রতাপশালী ভিনোদসাহেব কেঁচোর মতো গুটিয়ে মুটিয়ে এতটুকু। দালভি একটা স্যুট পরেছে বটে! ঠিক যেন ইমরান খান। পাশের ওই বোকা বোকা লোকটা ডাইরেক্টর। হিহি, হিহি। ওকে দালভির চাকর হলে মানাত বেশি। সিটের দিকে ফিরছি, কাচের ওপার থেকে ডোমা চোখ মারল। না বাবা, ওদের ঘরে এখন ঢুকছি না। বাছুরটাকে সামলাই। আমার পি বি এক্স বোর্ড। ফাইলটা বদ্রির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব? থাক, দরকার হলে ওরাই চাইবে। বদ্রি ছুটে জেন্টস টয়লেটে ঢুকল। কেন বলুন তো? ওখানে কোল্ডড্রিংকস রাখা আছে সাহেবদের জন্য।

ডোমা খুট খুট করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে,—'য়্যু আর রিয়েলি লাকি রাই...'

ডোমা পেছনে লাগার চেষ্টা করছে। আজ দারুণ সেজেছে। শাহজাদি স্টাইলের সিপিয়া সালোয়ার কামিজ।

—'সেজেছ তো তুমি।' এবার আমি চোখ টিপলাম।

ডোমা ছদ্ম শ্বাস ফেলল,—'তবু তো রজার আমাদের দিকে তাকায় না।'

—'মোস্ট ন্যাচারাল। দারোয়ানের দিকে সবাই আগে তাকায়।'

—'আই উইশ আই উড হ্যাভ বিন এ ডোরকিপার। লাইক ইউ।'

—'ফাজলামি রাখো। ওরা কী করছে? শার্লি, ক্রিশ্চিন?'

ডোমা কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল,—'শার্লির ইন্টারভিউ আছে। রেমিংটনে। বাট রিমেমবার, শি ইজ অন মেডিকেল লিভ টুডে।'

শার্লিরটা এসে গেল। আমার কবে আসবে কে জানে। মার্সনস-এরও খবর নেই। এতগুলো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়লাম...। আমার হয়তো ছোটমেসো, মীরাদি ছাড়া গতি নেই।

ইনকামিং কল আসছে। রিসিভার কানে তুললাম,—'মালহোত্রা ব্রাদার্স।'

—'পুট মি টু মিস্টার মেনন প্লিজ।'

এখান থেকে একটু জোরে ডাকলেই মিস্টার মেনন সাড়া দেবেন। তবু রিং বাজালাম। এটাই দস্তুর।

ডোমা টয়লেট থেকে ঘুরে এল,—' ক্রিশ্চিন ভীষণ আপসেট হয়ে রয়েছে বুঝলে।'

—'কেন? ম্যাথুজ কী বলছে?'

—'আরে আমরা জানতামই না ওদের মধ্যে অনেকদিন ধরে টাসল চলছে। ম্যাথুজ চাইছে ক্রিশ্চিনের যখন পাসপোর্ট আছে, এখখুনি বিয়ে করে ওর সঙ্গে চলে যাক। ক্রিশ্চিন রাজি নয়। নিজের জব ভাউচার না পেলে যাবে না। জোর ফাইট চলছে এ নিয়ে। গড ব্লেস, ওদের এনগেজমেন্ট না ভেঙে যায়। ম্যাথুজ যদি যাওয়ার আগে...'

দু নম্বর এক্সচেঞ্জ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ বাজছে এবার।

—'ইজ অশোক দেয়ার?'

মার্গারেট। সর্বনাশ করেছে। বড় সাহেবের প্রেমিকা, মীরাদির বান্ধবীর বান্ধবী। এর দয়াতেই আমার চাকরি। কী করি এখন? খুব বিনীতভাবে গলা নামালাম,—'বস ইজ এক্সট্রিমলি বিজি ম্যাডাম।'

—'তুমি অশোককে দাও আমাকে।'

আমি কি অশোককে কোলে চাপিয়ে দেব নাকি? এমন আহ্লাদির মতো কথা বলে। সুইচ অফ করে ডোমার দিকে তাকালাম,—'মার্গারেট। কী করি বলো তো? ভিনোদ ঘরে কোনও লাইন দিতে বারণ করেছে।'

—'দেন টেল হার টু রিং লেটার।'

তুই তো বাবা বলেই খালাস। আমি বলি কী ভাবে? মেমসাহেবের যা মেজাজ। চাইলে আমি আজ আছি, কাল নেই। কিন্তু সুইচ তো আমাকে নামাতেই হবে,—'ম্যাডাম যদি কিছু মনে না করেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে ডাইরেক্টররা এসেছেন। ওদের সঙ্গে জরুরি মিটিং...'

—'হেল উইথ দেম। তুমি অশোককে বলেছ আমি লাইনে আছি?'

মার্গারেট কিছুটা অধৈর্য যেন। মরিয়া হয়ে বললাম,—'আমি আপনাকে একটু পরে ফোন করছি।'

মেমসাহেবের আদুরে গলা সঙ্গে সঙ্গে হিসহিসিয়ে উঠেছে,—'আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি অশোককে বলেছ কি না।'

আমার কী দরকার বাবা পাকামি করার? ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক। মাঝখানে পড়ে আমি...। সুইচ তুলে রিং বাজিয়ে দিলাম। যাক, দুজনে কথা বলছে। ডোমা হাসল,—'ওদের ফোন ট্যাপ করেছ কোনওদিন? এ একবার ডার্লিং বললে, ও দশবার সুইটহার্ট বলে। ওরা লাভ মেকিংটা টেলিফোনেই সেরে নেয়।'

আমি আর ডোমা খুব হাসছি। হঠাৎ ভিনোদ এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই সচকিত।

—'হোয়াটস গোয়িং অন, হিয়ার? এটা কি অফিস? না আড্ডাখানা? হোয়াট ইউ আর ডুয়িং হিয়ার মিস লেপচা?'

ডোমা বড় সাহেবের স্টেনো। ভিনোদকে বিশেষ তোয়াক্কা করে না। সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে গেছে। কিন্তু আমি যাই কোথায়? ভিনোদ গনগনে চোখে ফিরেছে আমার দিকে,—'আপনাকে ও ঘরে এখন কল দিতে মানা করা হয়েছিল?'

উঠে দাঁড়িয়ে ঢোক গিলছি,—'ম্যাডামের কল ছিল।'

—'ড্যাম ইওর ম্যাডাম। আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলাম ডিসটার্ব না করার...'

—'ম্যাডাম শুনছিলেন না স্যার।'

—'স্টপ ইওর ব্লাডি এক্সকিউজ।'

এক ঘর লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে এদিকে। মিস্টার মেনন, ব্যানার্জিদা, সিনহা, বদ্রিও। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। শরীরের সব রক্ত বুঝি জড়ো হচ্ছে মুখে। মাথা নিচু করলাম,—'সরি স্যার। আমি এ ছাড়া কী করতে পারতাম?'

—'কী পারতেন জানেন না যদি, চাকরি করতে এসেছেন কেন? বাড়িতে গিয়ে রান্না-বান্না করুন।'

ছেলেটা আমাকে কী বিশ্রীভাবে অপমান করছে। চাকরি করতে এসেছি বলে কি সব হজম করতে হবে। আমরা ঝি চাকর! ইচ্ছে করছে ওর গালে একটা চড় মেরে চাকরি ছেড়ে চলে যাই। মাইনে যা দেয়, তার তিন ডবল খাটিয়ে নেয়। অ্যাবসেন্ট করলে টাকা কাটে!

চেঁচামেচি শুনে মালহোত্রা সাহেব বেরিয়ে এসেছেন,—'হোয়াটস দ্য ম্যাটার? চেঁচাচ্ছ কেন?'

—'তোমার এইসব স্টাফেরা...'

—'স্টপ ইট। কাম ইনসাইড। দে আর ওয়েটিং ফর ইউ।'

ভিনোদ গজগজ করতে করতে ফিরে গেল। চাই না আমার এ চাকরি। আসব না কাল থেকে।...কিন্তু তারপর? হোস্টেল ফিজ? কৃষ্ণনগরে ফিরে যাব? নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। আমার কিছু বলা উচিত ছিল ভিনোদকে। ছেলেটার এত কেন আক্রোশ আমার ওপর? ছোট্ট একটা ব্যাপারে...

চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। ঠকঠক করে কাঁপছি আমি।

দিনটাই আজ তেতো হয়ে গেছে। শ্রীকান্ত মজুমদার যথারীতি মিনিবাসের লাইনে আমার জন্য দাঁড়িয়ে। হতভাগা কিছুতেই আমার পেছন ছাড়বে না। কোনও অপমানই গায়ে মাখতে চায় না। কিছু কিছু মানুষ এমন নির্লজ্জ হয়। ও ঢাকুরিয়ার লাইনে। আমি রানীকুঠির কিউতে দাঁড়ালাম। চৈত্র এসে গেছে। যখন তখন ধুলোর ঝড় কলকাতার রাস্তায়। শ্রীকান্তবাবু ক্যাবলা ক্যাবলা মুখে হাসল। ঘাড় ঘুরিয়ে নিলাম। টেলিফোন ভবন টপকে সূর্যটা নেমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। লালদীঘির জলে তার শেষ আভাস। একটা লম্বা মিছিল টেলিফোন ভবনের সামনে দিয়ে চিৎকার করতে করতে চলে যাচ্ছে আর এন মুখার্জি রোডের দিকে। বোধ হয় এসপ্ল্যানেড ইস্টে যাবে। লাল ফেস্টুন উঁচু করে কী বলছে লোকগুলো বলুন তো?—জুলুমবাজি চলবে না—ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও—আমাদের অফিসে কোনও ইউনিয়ন নেই। তেরোটা লোকের অফিস, তার আবার ইউনিয়ন। থাকলে অবশ্য আমাকে ওইভাবে অসম্মান করতে পারত না ভিনোদ মালহোত্রা। কী বলেন? কপাল, কপাল, কপালটাই আমার

এরকম। সারাটা দিন অফিসে যে কীভাবে কেটেছে। মনে হচ্ছিল কারুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারব না কোনও দিন। ডোমা ক্রিশ্চিন বারবার বলছিল,—'তুমি ভিনোদের কথা গায়ে মাখছ কেন? ও ওরকমই মিসবিহেভিং। আগের রিসেপশনিস্ট মালা সেনকেও...' বড় সাহেব অবশ্য একবারও খারাপ ব্যবহার করেননি। দালভিরা, চলে যাওয়ার পর ডেকে কাজ দিয়েছেন। উনি কি শুনেছেন ভিনোদ আমাকে কী ভাবে...? বিকেলের দিকে মার্গারেটেরও ফোন এসেছিল। গলায় সেই পুরনো আহ্লাদি ভাব। যেন সকালে ও নয়, অন্য কেউ কথা বলেছিল। অফিসের সকলেও কিছুক্ষণের মধ্যে ভুলে গেল ঘটনাটা। হয়তো ভিনোদও মনে রাখবে না। কিন্তু আমি তো ভুলতে পারছি না। মনে পড়লেই দাউ দাউ জ্বলে উঠছে শরীরটা।

না, হোস্টেল নয়, মীরাদির কাছে যাব এখন। খুলে বলব সব। সিদ্ধার্থর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে? যাক। আজ আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব।

চণ্ডীতলায় লোডশেডিং। কলকাতার এই এক অসুখ। গরম পড়তে না পড়তে ইলেকট্রিসিটি উধাও। নানুবাবুর বাজার থেকে একটু ডান দিকে হাঁটলেই মীরাদিদের বাড়ি। রাস্তায় এত লোক, তবু কারেন্ট না থাকলে সব কেমন নির্জন নির্জন লাগে। মীরাদিদের পাশের বাড়ির রকে ছেলেরা আড্ডা মারছে। সবুজ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে আলতো ভাবে কড়া নাড়লাম।

—'আরে রাই। কতদিন পর এলি? কী খবর?'

এক ধাপ উঁচুতে মীরাদি। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত। থাক থাক কোঁকড়া চুল পিঠের ওপর ফেলা। চওড়া পাড় সাদা শাড়িতে মীরাদিকে একদম অন্যরকম লাগছে। মুখের ভাব সিদ্ধার্থর মতোই। তবে সিদ্ধার্থ যতটা লম্বা চওড়া, মীরাদি ততটা নয়, সিদ্ধার্থ দিদির থেকে ফর্সাও বেশি।

—'শংকর বলছিল তুই নাকি আজকাল বেহালাতেও যাচ্ছিস না। কী ব্যাপার, হোস্টেল এত ভাল লেগে গেল?'

মীরাদি হাত ধরে টানল। এখন আর আমার পা সরছে না। সিদ্ধার্থ বাড়ি আছে কি?

মীরাদি প্রায় আমাকে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। সামনেরটা ড্রয়িংরুম। যেখানে আমি প্রথমদিন এসে বসেছিলাম। তারপর সরু প্যাসেজ। একদিকে মীরাদি আর মাসিমার ঘর। উলটোদিকেরটা সিদ্ধার্থর। বাঁচা গেল। সিদ্ধার্থ নেই। বাইরে থেকে ঘরটায় ল্যাচ টানা।

মীরাদি ড্রেসিং টেবিলের ওপর হ্যারিকেন রাখল,—'আবার শুরু হল, বুঝলি। আধ ঘণ্টার ওপর গেছে, কখন আসে...'

আমি মীরাদির দিকে তাকিয়েই আছি। এই মহিলার সামনে এলে মনটা কেমন জুড়িয়ে যায়। আপনি আমাকে স্বার্থপর, সুবিধাবাদী যা খুশি ভাবতে পারেন এখন, আমি মীরাদির কাছে আসবই। সিদ্ধার্থর সঙ্গে সম্পর্ক থাকুক, না থাকুক। প্রথম যেদিন এ বাড়িতে এসেছিলাম ছোট মেসোর সঙ্গে, সেদিনই মীরাদি আমাকে জয় করে ফেলেছে। কী শান্ত ব্যক্তিত্ব। সে সময় আমাকে দেখলেই সকলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিয়ে ভাঙার কথা জিজ্ঞাসা করে। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি সবাই। নতুন পরিচিতরা হাবভাবে কৌতূহল দেখায়। বড় ক্লান্ত বোধ করি। জানেন, এই মহিলাই প্রথম, যিনি আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একটি প্রশ্নও করেননি।

—'অফিস থেকে আসছিস তো? কী খাবি বল?'

কোনও কথা বলিনি এখনও। কিছু বলতে হয়। হাসলাম মাথা নেড়ে,—'এখন কিছু খাব না।'

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে আমি। মীরাদি মোড়া টেনে বসল। কী ভাবে শুরু করি বুঝতে পারছি না। মীরাদিই অনুমান করে নিয়েছে,—'কিছু বলবি মনে হচ্ছে?'

—'না, মানে...মীরাদি এই চাকরিটা আমি করব না।'

—'কেন রে? কী হল?'

—'কী অপমানিত হয়েছি আজ...ওই মার্গারেট...আর ওখানকার ভিনোদ মালহোত্রা...এক অফিস লোকের সামনে...কী ইনসাল্ট তুমি ভাবতে পারবে না মীরাদি...'

কথা বলছি আর হাঁপাচ্ছি। মীরাদি ধৈর্য ধরে শুনল সমস্তটা। চুপ করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ,—'দ্যাখ তোকে একটা কথা বলি। চাকরি যদি ছেড়ে দিলি তো, ছেড়েই দিলি। কিন্তু তাতে ভিনোদ

মালহোত্রার এসে যাবে কিছু? না মার্গারেট দুঃখ পাবে? বরং আমি বলি কী নতুন কিছু যতক্ষণ না পাস, দাঁতে দাঁত চেপে...'

—'একটা প্রতিবাদও করব না?' উত্তেজিত হয়ে উঠলাম,—'একজন অন্তত ভিনোদের ব্যাড ম্যানার্স-এর প্রতিবাদ করুক।'

—'কী ভাবে? রেজিগনেশন দিয়ে?' মীরাদি শান্ত হাসছে,—'তাতে ওদের কী এসে যাবে? তোর জায়গায় আরেকটা মেয়ে...'

—'জানি।'

—'তা হলে ছাড়ার কথা ভাবছিস কেন? মাথা ঠাণ্ডা কর। চকরি করতে গেলে এরকম প্রবলেম আসেই। বাবা মারা যাওয়ার পর আমি যে প্রথম প্রাইভেট অফিসটায় ঢুকি, জানিস সেখানকার বস আমাকে কী প্রস্তাব দিয়েছিল? তার তুলনায় তোদের ভিনোদ তো দেবশিশু রে। মাথা গরম, একটু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। রাস্তাঘাটে হাঁটতে চলতে গেলে গায়ে ধুলো লাগে না? সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিবি।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি। মীরাদি এমন সুন্দর করে বোঝায়, এত ভাল কথা বলে...রাগটা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে যেন। তবু বললাম,—'যাই বলো মীরাদি, আমার একটা অন্য ভাল চাকরি চাই।' নিজের গলাই কেমন অবোধ, জেদি শিশুর মতো শোনাচ্ছে।

মীরাদি সামান্য গম্ভীর,—'দ্যাখ রাই, যখন কৃষ্ণনগরে ফিরে এসেছিলি তখন তোর পায়ের তলায় কী ছিল? মজা পুকুরে কচুরিপানার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলি। তখন মরে গেলেও মরে যেতিস, বেঁচে গেলেও মরে থাকতিস। আমরা হয়তো তেমন কিছুই পারিনি। কিন্তু একটু জমি তো দিয়েছি। তোর দাদা দিয়েছে সাহস, মাসি মেসো উৎসাহ, আমি ছোট একটা চাকরি...'

—'আমি তো সে কথা অস্বীকার করি না মীরাদি।'

—'অস্বীকার করার কথা নয়। এখন তোমার অর্জন করার পালা। ইউ বেটার আর্ন এ জব। এতে তোর যে আনন্দ হবে...'

হ্যারিকেনের আলো পড়ছে মীরাদির শরীরের বাঁ দিকে। ডানদিকের দেওয়ালে মীরাদির বিশাল ছায়া। সেই ছায়ায় আমি। মীরাদিকে বলব নাকি হোস্টেলের মেয়েদের কথা? কাকলি, মঞ্জুদি, বউদি...।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ। মীরাদি উঠল,—'বোস্ দেখি কে এল।'

টান টান হয়ে গেছি। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সিদ্ধার্থ! কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে আমার। অফিসের টেনশনের বদলে সিদ্ধার্থ ছড়িয়ে যাচ্ছে ভেতরে। ও কি সেদিনকার কথা বলে দিয়েছে সকলকে?

—'কীরে রাই কখন এলি?'

সিদ্ধার্থ নয়। মাসিমা! ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে আমার,—'এই তো কিছুক্ষণ।'

আমি এদের কেউ নই। অথচ কত সহজে এরা আপন করে নিয়েছে আমাকে। মাসিমার কথার ভেতরে খুব ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। এই ব্যক্তিত্বই বোধ হয় মীরাদির মধ্যে ছড়িয়েছে। আর হাসিখুশি ভাবটা সিদ্ধার্থর ভেতর। এঁর সামনে নিজের ছোটখাটো দুঃখকষ্টের কথা বলতেও লজ্জা হয়।

মাসিমা ঢুকতেই কারেন্ট এসে গেছে।

—'কী, রাইকে খাইয়েছিস কিছু?'

—'না। এই তো গল্প করছিলাম আমরা। বোস রাই, চা করে আনি। কটা পরোটা ভেজে দিই, খাবি?'

অফিসে ভাল করে টিফিন করাও হয়ে ওঠেনি। তবু খিদে পাচ্ছে না আজ,—'আমি শুধু চা খাব।'

—'খেয়ে যেতে পারতিস। তোদের হোস্টেলে যা খাবার দেয়।'

মাসিমা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খেয়েই যা। রাই, তুই আজকাল কোথাও যাস না কেন রে! মণিদীপা বলছিল কৃষ্ণনগরেও নাকি মাসখানেক যাসনি। তোর খোঁজে তোর মেসো একদিন গিয়েছিল হোস্টেলে। ছিলি না।'

—'কবে বলুন তো?'

—'গত রোববার বোধ হয়।'

—'ও, সেদিন শার্লির বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল। আমার অফিসের চাইনিজ বন্ধু। ডে-স্পেন্ট করতে গিয়েছিলাম।'

—'কোথায় থাকে? ট্যাংরায়? ওদিকে শুনেছি চিনারা একটা টাউন তৈরি করে নিয়েছে?'

—'না, ওদিকে নয়। বউবাজারের কাছে। ছাতাওয়ালা গলিতে। জানেন মাসিমা কত্তটুকুন জায়গায় কত জন মিলে যে থাকে ওরা। ওর বাবা ডেনটিস্ট। দাদা একটা লন্ড্রি করেছে। মা আর দাদা মিলে সেটা চালায়।'

—'কেমন সুন্দর বল তো,' মীরাদি হ্যারিকেনটা তুলে রাখল,—'আমাদের মা'রা ভাবতে পারে, বাইরে বেরিয়ে লন্ড্রি চালানোর কথা?'

—'ও কথা বলিস না মীরা। যাদের যা, তাদের তা। আমাদের তো ছোটবেলা থেকে সেভাবে বড় করা হয়নি। তা হলে আমরাও পারতাম। এখনকার মেয়েরা ঠিক পারবে। কীরে রাই, পাববি না?'

—'নিশ্চয়ই পারব। কৃষ্ণনগরে আমি তো সবার জামাকাপড় কাচতাম।'

আমি ইয়ার্কি জুড়েছি মাসিমার সঙ্গে। আস্তে আস্তে নিজেকে অনেক বেশি স্বাভাবিক লাগছে। কত দিন পর বুঝি হালকা ভাবে গল্প করছি। সেই কৃষ্ণনগরের বাড়ির মতন। মীরাদি পরোটা নিয়ে এল। সঙ্গে রুই মাছের ভুন্দালু। মাসিমা এই রান্নাটা দারুণ করেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে পালাই বাবা। সিদ্ধার্থ আসার আগেই। যদি হাত থেকে কেড়ে নেয়। পরোটা সবে ছিঁড়েছি, এবার বাইরে কলিং বেল। বেশ জোরে। সত্যি জোরে বাজল কি? নাকি আমার কানেই...। ঢক ঢক করে জল খেয়ে নিলাম। এবার নিশ্চয়ই...।

দরজা খোলার শব্দ। আমার হাত আবার ঘামে ভিজে সপসপ। খাওয়া ফেলেই উঠে দাঁড়িয়েছি। মাসিমা দরজার দিকে তাকিয়ে,—'কে এল রে মীরা?'

—'ও কেউ না। পাড়ার ছেলেরা। শীতলা পুজোর চাঁদা।'

সিদ্ধার্থ কি আমার সঙ্গে এভাবেই লুকোচুরি খেলবে নাকি? আশ্চর্য, মাসিমা কিংবা মীরাদি কেউ একবার ওর প্রসঙ্গ তুলল না পর্যন্ত। হয়তো জানে। হয়তো জানে না। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে হঠাৎ। কোনওরকমে খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম,—'চলি মাসিমা। মীরাদি...আসি।"

—'একবার কৃষ্ণনগরে ঘুরে আয়। মা বাবা ভাবছেন কত।'

—'যাব। দেখি যদি এ সপ্তাহে পারি...'

মীরাদি দরজা অবধি এল,—'ট্রাম ডিপোতে গিয়ে টিউব রেলে চলে যা। তাড়াতাড়ি হবে।'

এরা কি কিছুতেই সিদ্ধার্থর কথা বলবে না আমাকে? নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না,—'সিদ্ধার্থদা ফিরল না এখনও?'

গলাটা কি কেঁপে গেল আমার? নার্ভাস চোখে তাকিয়ে আছি মীরাদির দিকে।

—'কেন তুই জানিস না? ও তো দু সপ্তাহের অফিস ট্যুরে গেছে। হায়দ্রাবাদে। ওখানে ওদের কী একটা নতুন ব্রাঞ্চ খুলছে...হয়তো ও সেখানেই...'

সিদ্ধার্থ কি অভিমানে কলকাতা ত্যাগ করবে। আমার জন্য। মীরাদি একটু অবাক চোখে দেখছে আমাকে,—'তোর সঙ্গে দেখা হয় না টুকুনের? তোকে বলে যায়নি কিছু?'

অপ্রস্তুতভাবে মাথা নাড়লাম। মীরাদির চোখ এখনও স্থির। রাস্তায় নেমে জোরে হাঁটা শুরু করেছি।

কৃষ্ণনগরে এলে মনটা কেমন অন্যরকম হয়ে যায়। যেন আমার দুটো মন। একটা কলকাতার, একটা কৃষ্ণনগরের। কলকাতার যে মন সবসময় দেখছে, ছুটছে, এখানে এলেই সে মনে কী যে ক্লান্তি। এখানকার মনটাকে নিয়ে আমার বড় ভয় হয়।

কাল হাফডে ছিল। তিনটে নাগাদ হোস্টেলে ফিরে দেখি ভিজিটর্স রুমে ছোট মাসি টুম্পাকে নিয়ে বসে। আমাকে দেখেই পুঁচকে টুম্পা হাততালি দিয়ে উঠল,—'ওই তো দিদি এসে গেছে।'

ছোট মাসি বলল,—'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। তোকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।'

—'কোথায়?'

—'কোথায় আবার? কৃষ্ণনগরে। কী অসভ্য মেয়েরে তুই। দিদি জামাইবাবু ভেবে মরছে...আমার বাড়িতেও এক যুগ ধরে যাচ্ছিস না,...ব্যাপারটা কী?'

—'কিছুই না।' আমি হেসে ফেলেছিলাম,—'আজই তো সাড়ে ছটার ভাগীরথীতে যাব ঠিক করেছি।'

—'চল। আমিও যাব তোর সঙ্গে।'

ছোট মাসি যেন পারলে আমাকে বেঁধে নিয়ে যায়। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—'মেসো যাবে না?'

—'না। ও আজ ধানবাদ যাচ্ছে। সোমবার ফিরবে।'

—'তাই বলো। আমি ভাবছিলাম তুমি কী করে মেসোকে ছেড়ে...'

—'পাকামি করিস না। তোর মেসো যা তোর ওপরে চটে আছে না। একটা ভাল চাকরির খবর ছিল তোর জন্য...'

—'সে কী?' সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছি,—'আমার অফিসে ফোন করেনি কেন? এমা কী হবে?'

ছোট মাসি হেসেছিল অনেকক্ষণ পর,—'বুঝেছি। নিজের দরকার ছাড়া তুমি আমাদের খোঁজ নেবে না। তাই তো?'

তাড়াতাড়ি ঢোক গিলেছিলাম,—'বিশ্বাস করো ছোট মাসি, একদম সময় পাচ্ছি না।...কোথায় চাকরি গো? মেসো আমার অফিসে এসেও তো খবরটা দিয়ে যেতে পারত...'

—'ধীরে বৎস ধীরে, এত উতলা হয়ো না। চাকরিটা এখখুনি হওয়ার চান্স নেই। ওর অফিসের রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সামনের মাসে বিয়ে। তার জায়গায় যাতে তোকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, ও সেই চেষ্টাই করছে।'

—'মেয়েটা চাকরি ছেড়ে দেবে?'

—'শুনছি তো তাই।'

আশ্চর্য। এই বাজারে সহজে কেউ চাকরি পায় না। আর মেয়েটা বিয়ে বলে...বলতে গিয়েও সামলে নিয়েছিলাম নিজেকে। ছোট মাসিরা ছকে বাঁধা জীবনের মানুষ। এভাবে ভাবতে জানে কি।

আচ্ছা ছোট মাসি কি খুব সুখী? মেসোকে নিয়ে? টুম্পা আর ঘরসংসার নিয়ে? ট্রেনে আসতে আসতে প্রশ্নটা করেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত,—'মাসি, তোমার কখনও নিজেকে মেসোর ওপর ডিপেন্ডেন্ট বলে মনে হয় না?'

ছোট মাসি প্রথমটা বুঝতেই পারেনি আমার কথা। অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল,—'মানে?'

—'ধরো, এই যে তুমি তোমার সমস্ত কাজে মেসোর ওপর নির্ভর করে থাকো...'

—'সে তো তোর মেসোও আমার ওপর নির্ভর করে থাকে। আমাকে ছাড়া একদণ্ডও...'

—'আমি সে নির্ভরতার কথা বলছি না। আজ যদি মেসো তোমাকে ছেড়ে দিতে চায়, ধরো হঠাৎ অন্য কোনও মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল...।'

ছোট মাসির ভুরু কুঁচকে গেল। কয়েক সেকেন্ড যেন ভাবলও কিছু। তারপর হেসে উঠল খিলখিল করে,—'সে মুরোদ তোর মেসোর নেই।'

—'হলে কী হবে?'

—'কী আর হবে? মনে করব সেটাই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। কিন্তু আমাকে তুই ঐ সব কথা জিজ্ঞাসা করছিস কেন?'

কেন যে করছি তা যদি মাসি বুঝত। আমার মতো গলা ধাক্কা না খেলে কোনও মেয়েই বোধ হয় তা বুঝতে পারে না। কিংবা আমার ধারণা ভুল। হয়তো পরিপূর্ণ ভাবে কারুর ওপর নির্ভর করে থাকাতেও এক ধরনের সুখ আছে। আমি সে জীবনের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ পেলাম কই।

দুপুরে সবে খেয়ে উঠেছি, হঠাৎ, পিসি এসে হাজির। বেলঘরিয়াতে নতুন বাড়ি করেছে। আমি কোনওদিন যাই না বলে একগাদা অভিযোগ করল। যাব কী, পিসির প্রশ্নবাণকে আমি যে ভীষণ ভয় পাই। আমার এই লম্বা চওড়া চেহারার লাল টুকটুকে পিসিকে উকিল হলে ভাল মানাত। ছোট মাসি,

মা আর পিসি বড় ঘরে গল্প করতে বসেছে। দাদা গেল মুকুলদাদের বাড়ি ব্রিজ খেলতে। ভাইয়া তো সকাল থেকেই ব্যস্ত পঁচিশে বৈশাখের নাটক নিয়ে। আস্ত নাটকপাগল ছেলে হয়েছে। ওকে কাঁকনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। বাবা কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে বারান্দায় বসে ছিল। একটু আগে ছোট ঘরে শুতে গেল। আজকাল বেশি কথাবার্তা বলে না। কেমন মনমরা হয়ে থাকে। দিন দিন শরীর ভাঙছে। মারও আর আগের মতো সুন্দর স্বাস্থ্য নেই। কয়েক বছর আগেও মাথা ভর্তি কালো চুল ছিল। এখন বেশির ভাগই সাদা। মুখ জুড়ে ভাবনার কাটাকুটি। একটামাত্র বিপর্যয় সংসারকে কী প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়ে যায়, টর্নেডোর মতো!

টুম্পা বারান্দায় খেলা করছিল। ছোট মাসি টেনে ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেল। এই মেয়েটা যখন বড় হবে, তখনও কি কিছুই পালটাবে না সমাজের? ভাবনা? চিন্তা? নীতি? নিয়ম? দাদা বা ভাইয়ার মেয়ে হলে আমি একদম অন্যরকম ভাবে মানুষ করব তাকে। আর আমার মেয়ে হলে... দূর কী সব হাবিজাবি ভাবছি। রেলিং ধরে ঝুঁকলাম। নীচের তলার বউদি উঠোনে কাপড় মেলছে। মাস তিনেক হল নতুন ভাড়া এসেছে। আমার সঙ্গে তেমন আলাপ নেই? তবে মহিলার কৌতূহল সাংঘাতিক। অবশ্য কৌতূহল কারই বা কম? একবার সিঁদুর পরার পর যে মেয়ে তা মুছে ফেলে, তাকে নিয়ে চর্চা করাটাই সমাজের রীতি।

রেলিং থেকে সরে দাঁড়ালাম। নীচের উঠোনটুকু পেরোলে কাঠের গেট। তারপরে রাস্তা। দুটো বড় রাস্তার মাঝ বরাবর বলে সব সময় এপথ দিয়ে গাড়িঘোড়া চলাচল করে। বেশি যায় সাইকেল রিকশা। দিনরাত ভেঁপু ভেঁপু আওয়াজে পাড়া তোলপাড়। তবে এই মুহূর্তে রাস্তা নির্জন। অলস রোদ গায়ে মেখে শুয়ে আছে ছুটির দুপুর। শুধু ভৌমিকদের ছাদের আলসেতে একটি কাক তারস্বরে ডেকে চলেছে।

জলখাবারের টেবিলে সকালবেলা দাদা তিনটে একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছিল,—'নে, রেখে দে। গত মাসে নিসনি। দুমাসেরটা একসঙ্গে দিয়ে দিলাম।'

গত মাসে ইচ্ছে করেই নিইনি। এভাবে বারবার টাকা নিতে আমার খারাপ লাগে। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর দাদার মাইনে আর ভাড়ার টাকাতে সংসার চালায় মা। বাবা অবশ্য এক-আধটা টিউশনি করে এখনও। আবার টাকাটা না নিলে আমারই বা চলে কী করে? গত মাসে খুব টানাটানি গেছে।

—'কীরে ধর।'

কী যে হল, বলে ফেললাম,—'রেখে দে। লাগবে না।'

—'কেন তোর মাইনে বেড়ে গেছে নাকি?'

হায়রে মালহোত্রা ব্রাদার্সে আবার মাইনে বাড়া। তাও মাত্র কদিনের চাকরিতে।

—'না, তা নয়। তবে এখন দরকার নেই।'

—'পাকামি করিস না।' দাদার চোখ হাসছিল,—'তুই কি ভাবিস তোকে আমি এমনি এমনি টাকা দিই? একটা ভাল চাকরি পা, সুদে আসলে সব উশুল করে নেব তখন।'

হাত বাড়াতেই হল। যতই দেমাক দেখাই, দাদার এই সাহায্যটা আমার খুবই দরকার। হোস্টেলের ফিজ দেবার পর কটা টাকাই বা থাকে হাতে। ছোটমাসির কাছে থাকলে এ অভাব হয়তো হত না। কিন্তু সেখানে কি আমি নিজেকে...দাদাটা আমার সত্যিই দূরদর্শী। ঠিক বুঝেছিল এই প্রতি মাসে সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারটা আমাকে বিঁধবে। বিঁধবেই। আর ও তো সেটাই চায়।

বারান্দায় কোণে রাখা ইজিচেয়ারটায় বসলাম। আমাদের এই সাবেকি বারান্দায় কতদিন ধরে যে একভাবে পড়ে আছে চেয়ারটা।

একসময় দাদু সারাক্ষণ চুপ করে বসে থাকতেন এখানে। কত দিন ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছি,—'দিনভোর ফ্যাল ফ্যাল করে কাকে দেখো দাদু?'

একগাল সাদা দাড়ি আর ফোকলা গালে দাদু ভারী নির্মল হাসতেন,—'পৃথিবীটাকে শেষবারের মতো প্রাণভরে দেখে নিই গো রাইকিশোরী।'

—'কী এত দেখার আছে পৃথিবীতে?'

—'কী নেই গো? সব আছে। সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিচ্ছেদ, আলো-অন্ধকার, দিন-রাত্তির...'

ইজিচেয়ারের হাতলে আলতো হাত বোলালাম। ছেলেবেলা থেকেই এই চেয়ারটার সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তা হয়ে গেছে। দাদু বলতেন,—'এ চেয়ার কবে আমাদের বাড়িতে এসেছে জানিস? সেই একচল্লিশের ডিসেম্বরে। পার্লহারবারে যেদিন বোমা পড়ল, ঠিক তার পরের দিন।'

ঐতিহাসিক চেয়ারটায় বসার জন্য ছোটবেলায় দাদা ভাইয়ার সঙ্গে মারপিট লেগে যেত আমার। সবার সমান দাবি। শেষে মা ঝগড়া থামাতে গুমাগুম্ কিল মারত তিনজনেরই পিঠে। দাদু মারা যাওয়ার পর চেয়ারটার পেছনের দেওয়ালে একটা সিংহের মুখ আপনা আপনি ফুটে উঠেছিল। অবশ্য আমারই শুধু ওটাকে সিংহ মনে হত। দাদার মনে হত রাজবাড়ির দেউড়ি। ভাইয়ার হাতলঅলা টিউবওয়েল। এ নিয়েও কত তর্ক।

অনেক দিন পর নোনাধরা দেওয়ালের মানচিত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখছি। আদ্যিকালের বাড়ি। সেই দাদুর বাবার আমলে তৈরি। বহুদিন ভালমতো সংস্কার হয়নি। আমার বিয়ের সময় শুধু গোটা বাড়িটা আলগাভাবে চুনকাম করা হয়েছিল। তার বেশি করতে অনেক খরচা। ওপর ওপর চুন বোলানোর দরুন চার বছরেই সাদা রং আবার হলুদ। পলেস্তারা খসে ইট দাঁত বার করেছে। আগের মতোই স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় বাঘ, হাতি, ঘোমটাপরা বউ, সার্কাসের জোকার।...চতুর্দোলাটা কোথায় গেল? কোথায় যেন ছিল? দাদার ঘরের দিকটায় না? নাকি বাবা মার ঘরের দিকে? বুক মোচড় দিয়ে উঠল। এতদিন খেয়ালই করিনি আমার বিয়ের পর থেকে ওই ছাপটা একেবারে মুছে গেছে। অথচ কী নিখুঁত ছিল ছবিটা। আমি তখন ছোট। বাবা বলত,—'এটা হল গিয়ে রাই-এর চতুর্দোলা। এটা চেপে রাই শ্বশুরবাড়ি যাবে।' ভাইয়া তখনও হয়নি। বাবার কথা শুনে দাদা উচ্চিংড়ের মতো লাফাত,—'না, এটা চেপে আমি শ্বশুরবাড়ি যাব।'

মা দুলে দুলে গান করত,—'দোল দোল দুলুনি...' দাদা চিৎকার করত,—'বোনের দিকে নয়, আমার দিকে তাকিয়ে গান করো।' আমি বলতাম,—'না, আমার দিকে তাকিয়ে।'

ছেলেবেলায় ভাইবোনেরা তো এরকমই থাকে। দুজনেই সমান সমান। তারপর একটু একটু করে দুজনের জগৎ একেবারে আলাদা হয়ে যায়। ছেলেদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়াতে যে কী আকাশ পাতাল তফাত দাদা বুঝত না। আমিও না। কেন যে বুঝতে শিখতে হল। শৈশবের মতো নির্ভার নিশ্চিন্ত জীবনটা যদি...

চেয়ারের কোলে মাথা রাখলাম,—'আমাদের সেই সব দিনগুলোর কথা তোমার মনে আছে চেয়ার?'

চেয়ার নড়েচড়ে বসল যেন,—'খুব মনে আছে। আমার কোলেই তো সব মানুষ হলে তোমরা।'

—'দাদা তোমাকে কীরকম জ্বালাতন করত মনে পড়ে? কাদামাঠে ফুটবল খেলে এসে, হাত পা না ধুয়েই ধপাস করে বসে পড়ত তোমার ওপর। তখন মা এসে দাদাকে...'

—'আর তুমি? স্কুল থেকে ফিরেই আমার কোলে বসে অবিরাম দোল খেতে। মাঝে মাঝে বুড়ো এসে পেছন থেকে বিনুনি ধরে টানত তোমার। তুমি আঁ আঁ চেঁচাতে।'

—'ভাইয়া কেমন তোমার পিঠে চড়ে টিঙটিঙ লাফাত।'

—'হুঁ, সব মনে আছে আমার। আমি কি আর আজকের হে? আমার চোখের সামনে তোমার বাবা তোমার মা-কে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে। তখন আমার কী পালিশ, কী জেল্লা। তারপর ব্রত হল, তুমি হলে, বুড়ো হল...'

—'তোমার চেহারা কিন্তু হঠাৎ অনেক ঝিরকুটে মেরে গেছে চেয়ার।'

—'হবে না? এতদিন একসঙ্গে আছি, আমারও তো মায়া পড়ে। তোমাদের ভাল হলে আমি মনে মনে চকচকে হই, আর তোমাদের খারাপ হলে...'

—'আমার বিয়ের কথা বলতে চাইছ?'

—'হ্যাঁ, তোমার সেই ভুল বিয়েটা। সেই শিবপুরের বর। ছেলেটাকে বিয়ের দিনই দেখে আমার ভাল লাগেনি। বড় স্বার্থপর, লোভী লোভী চোখ। ওখানে তো তুমি মরতে গিয়েছিলে। ফিরে এসে দিনরাত আমার বুকে শুয়ে কাঁদতে, কখনও বসে থাকতে থম মেরে...'

—'যাক ও সব কথা। পুরনো ঘা কেন খোঁচাচ্ছ? তুমি কি চাও আবার রক্ত পড়ুক?'

—'আমি কেন চাইব? তুমিই তো ভাবো। না হলে এখানে এসে সর্বক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকো কেন? হাসো। কথা বলো। চিয়ার আপ। যাও, মা মাসি গল্প করছে...'

—'ভাল লাগে না। কৃষ্ণনগরে এলে আমার কিছু ভাল লাগে না।' আমি চোখ বুজলাম।

—'কেন রাই, এ শহরটা কী দোষ করল?'

—'জানি না। খালি মনে হয় এখান থেকেই আমার অনেক কিছু পাওয়ার ছিল। শুরু হওয়ার কথা ছিল এখান থেকেই।'

—'কী?'

—'একটা পথ। একটা ঠিকানা। একটা ডেসটিনেশন। যেখানে মানুষ পৌঁছতে চায়। অথচ ঠিক ঠিক শুরু করা গেল না। যেভাবে শুরু করেছিলাম...না, শুরু করেছিলাম বলা যায় না, যেভাবে শুরু হল, কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম রাস্তাটা ভুল। অন্ধগলি। ধাক্কা খেয়ে ফেরত এলাম। তারপরও এখান থেকে তো নতুন কোনও রাস্তা খুলল না আমার জন্য।'

—'এটা খাঁটি কথা হল না রাই। তোমার বাবা মা যদি আদর করে তোমাকে টেনে না নিত, তোমার দাদা যদি ধাক্কা দিয়ে কলকাতায় না পাঠাত, কোথায় যেতে তুমি? বলতে গেলে এই শহরটা থেকেই তো আবার সূত্রপাত।...'

—'তুমি বুঝতে পারছ না চেয়ার। আমি ঠিক এ কথা বলতে চাইছি না। আসলে এখানে এলেই বুকে একটা কষ্ট চিনচিন করতে থাকে। মনে হয় মনের ওপর পাতলা সরের মতো একটা ছায়া এসে পড়ছে। আহত শামুকের মতো খোলের ভেতর ঢুকে পড়ি। চেয়ার, আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারব না...'

—'আমি বুঝতে পারছি। তুমি এখানে এলেই মনে মনে ওই ছেলেটার কথা ভাবো। ব্রতর ওই সুন্দর মতন বন্ধুটার কথা।'

—'হয়তো তাই। হয়তো তাই নয়। আসলে আমার জীবনটা যেভাবে চলছিল...ভেঙে গেল...এখন যেভাবে কাটছে... যেভাবে কাটবে ভেবেছিলাম ছেলেবেলায়... বাবা মার আমাকে নিয়ে চাপা উদ্বেগ... দাদার ফিলিংস...স্বপ্নের নীলাঞ্জন... বাস্তবের অনিমেষ... সব কিছু সেই কষ্টটার মধ্যে মিশে থাকে।'

—'তা হলে বলো এখানে এসে তুমি নিজেকে পুরোপুরি দেখতে পাও।' চেয়ার দুলে উঠল।

—'কলকাতাতেও তো দেখি। তবে সেখানে শুধু ঢেউ আর ঢেউ। সেখানে আমার প্রতিটা মুহূর্ত প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে লড়াই করছে। আমার চারপাশের মানুষেরা, আমি, আমার যুদ্ধ, অপমান, গ্লানি, আশা, দ্বন্দ্ব, হয়তো বা একটু একটু রঙিন কল্পনাও—সবই আছে কলকাতায়। এখানে আমার সঙ্গে শুধু আমিই। আমার অতীত। অতীতের সুখ। অতীতের দুঃখ। চোখের সামনে এক অদৃশ্য আয়নায় সব যেন ফুটে উঠতে দেখি।'

—'রাই, এই রা আ আই...'

চেয়ার নয়, আরেকজন কে যেন ডাকছে আমাকে। কে এ এ? অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কার গলা? ঝাঁক ঝাঁক কুয়াশা সরিয়ে ফিরছি আমি।

—'কীরে, এখানে চোখ বুজে বসে কী বিড়বিড় করছিস নিজের মনে?'

ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। পিসি।

—'ঘুম পেয়ে থাকলে ঘরে গিয়ে ঘুমো না।'

—'না না, ঘুমোইনি।' দুচোখ ঘসে নিচ্ছি ভাল করে,—'এমনি বসে থাকতে থাকতে চোখ জুড়ে গিয়েছিল।'

পিসি বারান্দার ওদিকে গিয়ে পানের পিক ফেলে এল,—'তোদের তো আবার দুপুরে ঘুমের অভ্যেস নেই। চাকরি বাকরি করিস। তা হ্যাঁ রে, কেমন চলছে, চাকরি?'

—'ভালই।'

—'হোস্টেলে নাকি ভাল খাওয়া দাওয়া দেয় না? তোর মাসি বলছিল...'

—'না, না, যা দেয় তাতে পেট ভরে যায়।'

—'অনেক মেয়ে থাকে?'

—'হুঁউউউ।' উঠে দাঁড়ালাম,—'তুমি বোসো।'

ভারী শরীরটাকে ঝপাত করে ইজিচেয়ারে ফেলে দিল পিসি,—'মেয়েগুলো সব কেমন? ভাল? শুনেছি যত সব বিয়েভাঙা মেয়েরাই হোস্টেলে গিয়ে...'

—'তা কেন হবে? কুমারী মেয়েও আছে অনেক। বাইরে থেকে কলকাতায় চাকরি করতে এসেছে। একটা মাদ্রাজি মেয়েও আছে। ভাল বাংলা বলতে পারে।'

—'তা হলে ওখানে ভালই আছিস বল।' ঘাড় ঘুরিয়ে পিসি আপাদমস্তক দেখছে আমায়,—'তোর নতুনদা কদিন আগে তোকে অফিস পাড়ায় দেখেছে বলছিল সকালবেলায়...'

—'এমা, আমাকে ডাকেনি কেন?'

—'তুই একটা লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁটছিলি, তাই ডাকেনি।'

প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে সুপুরি কাটছে পিসি। একটু ঘাবড়েই গেলাম। কার সঙ্গে দেখেছে নতুনদা? সিদ্ধার্থর সঙ্গে তো বহুদিন দেখা হয় না। অজয় সিনহা অবশ্য অফিস ঢোকার মুখে দেখা হলে কথাবার্তা বলে। সেও তো সেরকম কিছু নয়।

—'কোন সময় দেখেছে বলো তো?'

—'ওই সকালের দিকে, অফিস টাইমে।'

তা হলে বোধ হয় চন্দনার ননদাই। এখনও চিনেজোঁকের মতো লেগে আছে আমার পেছনে। কিছু বলতে পারি না বলে আরও মজা পায়। রোজ সঙ্গে সঙ্গে অফিস পর্যন্ত...কিন্তু পিসিটি তো আমার এত কথা বুঝবে না। সর্বত্র খবর রটিয়ে বেড়াবে এখন। মা মাসি হয়তো জেনেও গেছে, আমাকে ডালহাউসিতে আজকাল সকাল বিকেল একটা ছেলের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে দেখা যায়। চিরকালই ছোট্ট ঘটনাটাকে রংচং মাখিয়ে ফুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পিসির জুড়ি নেই।

রেলিঙের ধারে গিয়ে ঠোঁট ওলটালাম,—'আমার কোনও অফিস কলিগ হবে হয়তো।...তোমাদের খবর বলো। খুকুদির বাচ্চাটা কত বড় হল?'

—'এই তো সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে।' পিসি কোনওরকমে পাশ কাটিয়েই মূল প্রসঙ্গে ফিরে এসেছে,—'দেখো বাবা, কলকাতা জায়গা খারাপ। আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশো না। এমনিতেই হোস্টেলে থাকা মেয়েরা শুনেছি...'

যাক, আমার উদ্ধারকর্ত্রীরা এসে গেছে বারান্দায়। মা, ছোট মাসি। কথা ঘোরাতে চাইলাম—'চা হচ্ছে না মা?'

—'বসিয়েছি।' মা পিসির দিকে তাকাল,—'তুমি একটু গড়িয়ে নিতে পারতে ঠাকুরঝি। আবার অতটা ফিরবে...আজ বরং থেকেই যাও না।'

—'না আঃ' পিসি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে,—'না ফিরলে বাবুর অসুবিধে হবে। তবে ভাগ্যিস আজ এলাম। রাই-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আজকাল তো একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে।'

ছোট মাসি চুপচাপ রেলিঙ-এর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মা হাই তুলল,—'তা যা বলেছ। আমরাই এবার কতদিন পর দেখা পেলাম। তাও মণি জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে তাই।'

মার এখনও অভিমান যায়নি। কাল রাত থেকেই ভাল করে কথা বলছে না। বাবারও মুখ ভার হয়েছিল। তবে আমি সামনে দাঁড়াতেই তা কেটে গেছে। মার গলা জড়িয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছে। হেসে ফেললাম,—'মোটেই আমাকে ছোট মাসি ধরে আনেনি। আমি তো নিজেই কাল আসছিলাম। আসলে প্রতি সপ্তাহেই কোনও না কোনও ব্যাপারে এমন আটকে যাই...'

—'কলকাতার ওই তো মজা।' পিসি আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল,—'রঙিন নেশা সব পিছুটান ভুলিয়ে দেয়।'

—'সেটা অবশ্য একদিক থেকে ভালই। সব ভুলে ওখানে গিয়ে যদি রাই ভাল থাকে...'

—'ও কথা বললে তো চলবে না বউদি। মেয়ের প্রতি তোমাদেরও কর্তব্য আছে। একবার ভুল হয়ে গেছে বলে সব ছেড়ে বসে থাকাটাও কাজের কথা নয়। বিদেশ বিভুঁই-এ একা একটা মেয়ে পড়ে থাকবে সারাজীবন, এ আবার কেমন? যে কোনও সময় মন চঞ্চল হতে পারে। আমি বলি কী, এবার ওর সম্পর্কে কিছু একটা ভাবা দরকার।'

ধুর। আবার শুরু হল। আমাকে নিয়ে চর্চা করে শেষ হবে এদের? পিসির মুখের ওপর দু-চার কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি যে কিছুই বলতে পারি না। ঠিক ঠিক সময়ে আমাকে বোবায় ধরে। ঘরে ঢুকে এলাম। শুনতে পাচ্ছি ছোট মাসি প্রশ্ন করছে,—'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

পিসি গলা নামাল,—'আমি আর কী বলব? পাঁচজন পাঁচ কথা বলে তাই...'

—'কী রকম?'

—'বাদ দাও ও সব কথা। আমি গায়ে মাখি না। হাজার হোক রাই আমাদেরই মেয়ে। ওর ব্যাপারে আমাদেরই তো ভাবা উচিত। তাই না?'

কান মাথা গরম হয়ে উঠেছে। কিছুতেই কি এরা আমার মতো করে আমাকে থাকতে দেবে না? মেয়েরাই বোধ হয় মেয়েদের নিশ্চিন্তে বাঁচতে দিতে চায় না। রান্নাঘরে চলে এলাম। দাদা থাকলে বাড়ির কেউ আমাকে নিয়ে আলোচনায় বসার সাহসই পেত না।

চায়ের ট্রে নিয়ে বারান্দায় ফিরছি, মার গলা কানে এল,—'আমি ওকথা তুলতে পারব না ঠাকুরঝি। দরকার হলে তুমিই বলো।'

ছোট মাসি বলল—'আমারও তাই মনে হয়। ব্রত বা জামাইবাবুর সঙ্গে কথা না বলে ওকে কিছু বলা ঠিক হবে না।'

কী বলতে চায় ওরা? পিসি কী পরামর্শ দিল? মা মাসিও বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে?

বারান্দার পাশে রাখা ছোট টুলের ওপর ট্রে রাখলাম। না তাকিয়েও বুঝতে পারছি ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। নিজেকে প্রাণপণে শক্ত রাখার চেষ্টা করছি। আমারই মা, পিসি, মাসি আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে, হয়তো আমার ভালর জন্যই, তবু কেন এত অপমানিত বোধ করছি? আগে তো এমন হত না।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পিসি কথা আরম্ভ করল। 'বুঝলি রাই, তোর পিসেমশাই বলছিল, একটা ভাল ছেলে আছে, মনটা খুব উদার, তোর মতোই নামমাত্র বিয়ে হয়েছিল, সে আবার বিয়ে করতে চায়।'

—'ভাল তো।' আমি সহজভাবে বলতে চাইলাম।

—'ডিভোর্স হওয়া মেয়েতেও তার আপত্তি নেই। তোর তুলনায় বয়সটা একটু বেশি। তবে ছেলে একেবারে হিরের টুকরো। তোর যদি মত থাকে তো খোঁজ খবর নিই।'

—'কী করবে খোঁজ নিয়ে?'

—'তোর সঙ্গে বিয়ের ঠিক করব। আমরা চাইছি...'

সোজাসুজি তাকালাম,—'তোমরা চাইলেই আমি আবার বিয়ে করব ভাবছ কী করে?'

—'দ্যাখো, মেয়ের কথা।' পিসির গলায় আহ্লাদি সুর,—'কবে কী হয়েছে, তা ধরে বসে থাকলে মেয়েদের জীবন চলে? তোর ডিভোর্সও তো হয়ে গেছে ধর দেড় বছরের ওপর। তা ছাড়া এই তো খুকুর বর খবর এনেছে অনিমেষ সামনের মাসে ফের বিয়ে করছে। সে যদি করতে পারে, তুই কেন যোগিনী হয়ে থাকবি?'

ব্যাপার তা হলে এই। এতক্ষণে ধোঁয়ার আড়াল থেকে পিসি বেরিয়ে আসছে। অনিমেষের বিয়ের খবর দিতেই এসেছে আজকে। মারও বলিহারি যাই। পিসির কথায় নেচে উঠেছে। মার কি ধারণা আমি অনিমেষের কথা ভেবেই মনমরা হয়ে থাকি? একবার ভেবেও দেখল না অনিমেষের আবার বিয়ে করা না করাটা এখন আমার কাছে কতটা মূল্যহীন। ওই লোকটার সঙ্গে শারীরিক কিছু অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনও সুখের স্মৃতিই আমার মনে নেই। ছিলও না কোনওদিন। শান্তভাবে বললাম,—'তুমি ভুল করছ পিসি। তোমার ও খবরে আমার কিছু যায় আসে না।'

মা ঝপ করে বলে উঠল,—কিন্তু তোকেও তো থিতু হতে হবে রাই। এভাবে ভেসে ভেসে মেয়েদের জীবন কাটে না।'

—'মা প্লিজ।' আমার গলা ভেঙে আসছে এবার,—'একবারটি আমাকে আমার মতো জীবনটাকে গড়ে নিতে দাও। দোহাই তোমাদের।'

—'এরকম ছেলে কিন্তু আর পাবে না বউদি।' পিসি তবু গজগজ করছে।

ছোট মাসির দিকে তাকালাম। এখনও আমার হয়ে কিছু বলছে না কেন? তবে কি মাসিও চায় আমি যেমন তেমন ভাবে জড়িয়ে যাই আবার? নতুন কোনও গাছে? মেয়েরা কী? পরজীবী? পরগাছা?

পিসির দিকে কঠিন চোখে তাকালাম।—'দ্যাখো, আমাকে নিয়ে কোনওরকম আলোচনা আমার ভাল লাগে না। তোমরা অন্য কোনও কথা বলো।'

পিসি চোখ ঘোরাচ্ছে,—'শুনলে বউদি? মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলতে দিলে এরকমই কথা শুনতে হয়। তখনই বলেছিলাম, বাইরে চাকরি করতে পাঠিয়ো না। দাদা কি মেয়েকে খাওয়াতে পারত না? না, ও ব্রত বুড়োর কাঁটা হয়ে থাকত? সবাই মিলে চাইলে মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক। দ্যাখো কেমন দাঁড়িয়েছে।'

বাইরের লোকরা সুযোগ পেলেই আমাকে অপমান করে। নিজের লোকেরা কি তার থেকেও নিষ্ঠুর হয়? নিজের ওপর ঘেন্নায় চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। দেয় না, দেয় না, মেয়েদের কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না। কেন সেদিন হাসপাতালে মরে যাইনি? কেনই বা জন্মেছিলাম? জন্মালামই যদি দাদার মতো ছেলে হয়ে জন্মাইনি কেন? কেউ তা হলে এত খবরদারি করতে পারত না আমার ওপর। আমাদের পরিবেশে একটা মেয়ে স্বাধীন অস্তিত্বের কথা চিন্তা করলে, সবাই বোধ হয় এভাবেই তাকে পাঁচিলে গেঁথে ফেলতে চায়। আর সেই বর্শার সব থেকে ধারালো ফলা হয় মেয়েরাই। এটাই মেয়েদের জীবনের আয়রনি। মা নয়, পিসি নয়, মাসি নয়, নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে আমার।

দশ

কাঁকনকে দেখুন। মেয়েটার খুশি বুঝি আর ধরে রাখা যাবে না। আবার বসন্তের ছোঁয়ায় ফুলের মতো ফুটে উঠছে নিত্যনতুন করে। দিনরাত আবীরের সঙ্গে ঘুরছে। এখান সেখান, দোকান বাজার। আবীরের ছোট্ট ফ্ল্যাটটাকে আরও কত সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা যায়, সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত সারাক্ষণ। সামনের মাসে বালুরঘাটে যাবে। ফিরে আসার পর জুলাই-এ ওদের বিয়ে। সন্ধেবেলা আজকাল আর মেয়েটাকে পাওয়াই যায় না হোস্টেলে। যা একটু দেখা হয় সকালবেলাই। সে সময়ও যেন স্বপ্নের ফেনায় ডুবে থাকে কাঁকন। শুধু আবীর, আবীর আর আবীর। মঞ্জুদির ঘণ্টার শব্দে বিরক্ত হয় না একটুও। শেফালিকে ডেকে ডেকে কথা বলে। এমনকী শুভ্রার ওপরও আর ঘৃণা-বিতৃষ্ণা নেই। আমাকে পেলে একটানা বকবক করে যায়। শুধু আবীরের গল্প আর ভবিষ্যতের হাজার পরিকল্পনার কথা। তার মধ্যেও এক একদিন হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। আমার গলা জড়িয়ে প্রশ্ন করে,—'এবার শান্তি পাব তো রে রাই?'

জানি না কেন গলার কাছে তখন একটা ব্যথা টনটন করে আমার,—'কেন পাবি না? নিশ্চয় পাবি।'

—'মণীশ যদি আমাকে একটুও বুঝতে পারত, তা হলে হয়তো...'

বুক দুকদুক করে ওঠে। মণীশকে ভুলতে না পারলে কী করে আবীরকে ভালবাসবে কাঁকন? ওর দু হাত চেপে ধরে বলি,—'পুরনো কথা ভুলে যা কাঁকন। তোর সামনে এখন নতুন। সব নতুন।'

—'জানিস আবীর বলেছে এবার থেকে শুধু ব্যবসাতেই মন দেবে। আর আমি নাটক করব প্রাণভরে। কত চরিত্রকে আমার ভেতর দিয়েই ফুটিয়ে তুলব দেখিস।'

—'ভাল তো।'

—'তোকে কিন্তু প্রত্যেক রোববার আমাদের ফ্ল্যাটে যেতে হবে। সারাদিন থাকবি, খাবি, গল্প করবি। আবীরকে তোর খুব ভাল লাগবে দেখিস। ওর হৃদয়টা এত বড়, এত সুন্দর করে কাছে টেনে নেয়...

কথা বলতে বলতে এভাবেই আবার আবীরের মধ্যে ডুবে যেতে চায় কাঁকন। আমি ওকে দেখি। শুধু দেখি। আগের মতো কাঁকন এখন আর আমার কথা শোনার সময় পায় না। আমিও বলি না। কেন মিছিমিছি ওর আনন্দের মুহূর্তগুলোতে আমার হতাশার ছায়া ফেলি! অথচ মন খুলে কারুর সঙ্গে কথা বলতে বড় ইচ্ছে করে। নিজের প্রতিটি অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির কথা। আরেকটা যদি সত্যিকার বন্ধু থাকত আমার, কাঁকনের মতো! কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে আসার পর থেকে কী যে এক উজান স্রোতে ভাসছি, ভাসছি, ভেসেই চলেছি। দম নেওয়ারও সময় পাচ্ছি না যেন। অ্যালেনবেরি থেকে রিগ্রেট লেটার এসেছে। খবরের কাগজ দেখে অতগুলো যে দরখাস্ত ছেড়েছিলাম, দুটোর উত্তর এসেছে মাত্র।

পরশু একটা ইন্টারভিউও দিয়ে এলাম। তবে ও চাকরিটাও আমার হবে না। একটাই টেলিফোন অপারেটর পোস্টের জন্য চল্লিশ জনকে ডেকেছিল। তাদের মধ্যে অনেকের অভিজ্ঞতাই আমার থেকে বেশি। সাজ-পোশাক চালচলনেও অনেক স্মার্ট। এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না, বিয়ের বাজারে যেমন, চাকরির বাজারেও সুন্দর মুখের জয় আগে। ও সব বিলিতি কায়দার অফিসে তুলতুলে চেহারার বিল্‌কি-সিলকি মেয়েদের সুযোগ হবে না তো কি আমাদের হবে! না, কাউকে হিংসে করছি না। নিজের অযোগ্যতার কথা বলছি। মন দিয়ে লেখাপড়াটাও যদি করতাম। দাদা বলছিল সন্ধেবেলার ল' ক্লাসে ভর্তি হয়ে যেতে। টাকা পয়সা যা লাগে দিয়ে দেবে। না, আর কারুর সাহায্যে নয়, এবার যা করব নিজে নিজেই করব। পায়ের তলার মাটিটা একটু শক্ত হলেই...। দোসরা জুন আরেকটা ইন্টারভিউ আছে। তার পরের মাসে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা। দেখি একটু বইপত্র উলটে সরকারি অফিসে কেরানির চাকরি একটা জোটানো যায় কি না। মালহোত্রা ব্রাদার্সের ওপর আর নির্ভর করা যাচ্ছে না। অফিসের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।

গত সোমবার টিফিনের পর মিস্টার মেননের কাছে একটা ফাইল নিয়ে গেছি, দেখি ভদ্রলোক শুকনো মুখে মাথা নিচু করে বসে। আমি যে সামনে দাঁড়িয়ে আছি, খেয়ালই নেই। এত অন্যমনস্ক তো থাকেন না কখনও। রীতিমতো চটপটে কাজপাগলা মানুষ। নিচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—'আর ইউ ফিলিং সিক মিস্টার মেনন?'

ভদ্রলোক চমকে তাকালেন,—'ও মিসেস মিত্রা। প্লিজ সিট ডাউন।'

এই মিসেস মিত্র ডাকটা আর পালটানো গেল না। অফিসে সবাই জানে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে অনেকদিন, তবুও...। আসলে দোষটা আমারই। কলকাতায় যখন প্রথম আসি, সিঁদুর পরতাম বোকার মতো। কেন যে পরতাম। অথচ তার প্রায় বছর খানেক আগেই সব চুকে বুকে গেছে। তাও পরতাম। সংস্কার নয়, আমি আসলে মনে মনে তখনও কিছু হীনম্মন্যতায় ভুগছি। চরম অপমানের লজ্জাটাকে বোধ হয় ঢাকা দিতে চাইতাম ওভাবেই। বুঝতে পারিনি, পাঁচজনের কাছে নয়, নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়েছি। কাঁকনই প্রথম আমার এই জড়তা কাটিয়ে দেয়। যাকগে, মিসেস মিত্রই হই, কি মিস চৌধুরী, ডাকে কী আসে যায়। আমি তো আমিই। তবে এরপর কোথাও চাকরি পেলে কাউকে আর মিসেস মিত্র বলে ডাকার সুযোগ দেব না।

মিস্টার মেনন আমাকে বসতে বলেও কথা বলছেন না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম,—'এনিথিং রং উইথ ইউ? বাড়ির খবর ভাল তো?'

ভদ্রলোক দুদিকে মাথা নাড়লেন। অভ্যাসমতন টাকে হাত বোলালেন বার কয়েক, —'আপনি মিস লেপচার কাছে কিছু শোনেননি?'

—'না তো।'

—'অফিসে বেশি ডিসকাস করবেন না। খবরটা খুব সিক্রেট। ভিনোদের ফ্যামিলির সঙ্গে বসের একটা বড় ক্ল্যাশ চলছে। প্রোব্যাবলি দা কোম্পানি ইজ গোয়িং টু ব্রেক আপ ভেরি সুন।'

মাথা থেকে পা অবধি আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, —'সে কী! জানি না তো কিছু!'

—'হ্যাঁ, ম্যাডাম। সেজন্যই দালভি সাহেব আবার এসেছিলেন লাস্ট উইকে। দে হ্যাড আ লঙ সেশন। ভিনোদ চায়...'

বুঝতে পারছিলাম না মিস্টার মেনন আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন, না নিজেকে। ভারী বিমর্ষ দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে, —'এতদিন ধরে এ কোম্পানিতে আছি, সেই লোচনদাস মালহোত্রার আমল থেকে, এখন যদি সব ভেঙেচুরে যায়...'

—'ডোমা সব জানে?'

—'নিশ্চয়ই। তবে মিস লেপচাও তো কোম্পানি ছেড়ে দিচ্ছে।'

শার্লি রেজিগনেশন দিয়েছে জানি। সামনের মাস থেকে রেমিংটনে জয়েন করছে। কিন্তু ডোমা? ডোমা কেন কিছু বলেনি আমাকে? চুপি চুপি কাউকে না জানিয়ে ভাল জায়গায় চলে যেতে চায়। এত স্বার্থপর তো মনে হয়নি মেয়েটাকে। অন্তত আমাকে বলতে পারত। আমি কি ওর ভালটাকে কেড়ে

নিতাম। হায় রে, সে ক্ষমতাও যদি থাকত আমার। আমি বোকা তো বোকাই। আগেই লক্ষ করা উচিত ছিল ডোমা, শার্লি বা ক্রিশ্চিন, অনেক কথা বললেও, নিজেদের কেরিয়ার প্রসঙ্গে একেবারে মুখে কুলুপ এঁটে রাখে। এটাই হয়তো চাকরি জীবনের নিয়ম। কোথাও ইন্টারভিউ দিলেও সহজে কেউ জানাতে চায় না। ক্রিশ্চিনও কি অফিসের গণ্ডগোলের কথা জানে? মেয়েটা তো মাঝে নিজের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

হ্যাঁ, ক্রিশ্চিনের এনগেজমেন্টটা শেষ পর্যন্ত ভেঙেই গেছে। বেশ কিছুদিন হল ম্যাথুজ চলে গেছে সিডনিতে। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে, পরপর তিনদিন ক্রিশ্চিন আসছে না দেখে আমরা গিয়েছিলাম নীলহাট হাউসে খোঁজ নিতে, ওর বোন নীলোফারের কাছে। আচার আচরণ, পোশাক আশাক এমনকী চেহারাতেও দুই বোনে কোনও মিল নেই। ক্রিশ্চিনের মতো চোখ দুটো নীলচে বটে, তবে চুল একেবারে চিকচিকে সোনালি। মনে হয় সোনালি করে নিয়েছে। পরির মতো সেই সোনার চুল নাচিয়ে নীলোফার বলেছিল—'ও গড। দে হ্যাড আ হরিব্‌ল্ ফাইট। আমরা ক্রিশ্চিনকে অনেক বুঝিয়েছিলাম। মা, বাবা, ডিক কারুর পরামর্শ শুনল না। বুদ্ধু মেয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারল।'

ডোমা বলল,—'কিন্তু ও'ও তো অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে আছে।'

—'ছাই। সত্যি যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে জেদ ধরে পড়ে থাকবে কেন? আসলে ওর নেচার একেবারে আমার দাদুর মতন। একগুঁয়ে। ফুলিশ।'

শার্লি বলল—'ম্যাথুজ একটু কনসিডার করতে পারত। জবভাউচার পেলেই তো ক্রিশ্চিন চলে যাবে।'

—'হোয়াই? আফটার অল হি ইজ আ ম্যান।' নীলোফার ফটফট করে উঠল। বোঝাই যাচ্ছিল ক্রিশ্চিনের সিদ্ধান্তে সে একটুও সন্তুষ্ট নয়, —'ম্যাথুজ কিছু অন্যায় দাবি করেনি। ক্রিশ্চিন ওকে বিয়ে করে ওখানে গিয়েও চাকরি জোগাড় করতে পারত। ওদেশে কিছু জোগাড় করা কখনই এখানকার মতো টাফ নয়।'

ডোমাও ওকে সমর্থন করেছিল,—'ক্রিশ্চিনের এত অ্যাডামেন্ট হওয়া ঠিক হয়নি। সত্যি যদি ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, তবে এরকম ইগো থাকার কোনও মানেই হয় না।'

শার্লি বলল,—'বোঝাই যাচ্ছে ওদের মধ্যে আণ্ডারস্ট্যান্ডিং-এর অভাব ছিল। ভালই হয়েছে। সঠিক বোঝাপড়া না থাকলে কখনই বিয়ে করা উচিত নয়।'

—'রাইট! লাভ ইজ নাথিং বাট সিম্পলি আ ভেগ টার্ম।' নীলোফার চোখ ঘুরিয়েছিল,—'বাট আই পিটি হার। ইফ মাই ম্যান গেটস আ চান্স লাইক ম্যাথুজ, আ'ইল ব্লাইন্ডলি মুভ উইথ হিম।'

—'ঠিক বলেছ. হাউসওয়াইফ হয়ে কটা দিন কাটানোর মতো সুখ কি আর কিছুতে আছে?'

আমি নীরবে ওদের কথা শুনছিলাম। এ বোধ হয় সেই নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস...। সব জাতের সব মেয়েই একটা জায়গায় তবে মনে মনে এক! হয়তো এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তা যাই হোক, মেয়েগুলোর কাছ থেকে আমি একটা নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছি বইকী। আর ক্রিশ্চিন? ও তো আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে আত্মমর্যাদাবোধ কাকে বলে। মনের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আবার দিব্যি কাজে এসেছে। একেবারে স্বাভাবিক। মনেই হয় না ওর জীবনে ম্যাথুজ বলে কেউ কোনওদিন ছিল। আগের মতোই হাসছে, গল্প করছে। ডোমা বা শার্লি ওকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। ওদের দেখাদেখি আমিও না। অথচ মজা দেখুন, আমার পুরনো বান্ধবীরা এখনও দেখা হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাঙা বিয়েটার কথা জিজ্ঞাসা করবেই। এই তো কৃষ্ণনগর থেকে আসার দিন ভোরের ট্রেনে নূপুরের সঙ্গে দেখা। নূপুর, আমার সেই স্কুলের বান্ধবী। খুব মোটা হয়েছে। ভরাট মুখে সিঁদুরের চাকা টিপ, সিঁথি লালে লাল, কানে ঝুমকো দুল। গায়ের রং আরও ফর্সা হয়েছে। তার ওপর ফাউন্ডেশনও মেখেছিল খুব। বিয়ের আগে একেবারে উমনো ঝুমনো থাকত।

ছোট মাসি আর টুম্পার কাছ থেকে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গেল ওদের সিটে। বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। এত্তটুকুন ফুটফুটে একটা ছেলেও হয়েছে ওদের।

নূপুর জিজ্ঞাসা করল,—'কলকাতায় তুই কোথায় থাকিস রে এখন?'

—'ওই একটা হোস্টেলে।' আলগা হাসলাম,—'তুই কোথায়? সোদপুরেই?'

—'না রে, কিছুদিন হল কল্যাণীতে কোয়ার্টার পেয়েছি, ওর অফিসের।' নূপুর গলা নামাল,—'ভালই হয়েছে বুঝলি। শাশুড়ির সঙ্গে মোটে বনছিল না। যা একখানা চিজ না।'

নূপুরকে দেখে সেই মুহূর্তে কেমন একটা চাপা হিংসে হচ্ছিল আমার। ওর ফুলের মতো ছেলেটা ত্যা ত্যা করে আবোল তাবোল বকছে। বুকটা হা হা করে উঠেছিল। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমারও হয়তো ওরকম একটা বাচ্চা থাকত।

নূপুর খুশিতে গলে গলে পড়ছিল,—'উঃ, কী দস্যি যে হয়েছে আমার ছেলেটা। ঠিক ওর বাবার মতন। সারাদিন জ্বালাতন করে মারে।'

কিছুটা ঈর্ষা আর কিছুটা বিস্ময় বুকে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে নূপুরকে দেখছিলাম। কত বদলে গেছে মেয়েটা। কথাবার্তা, হাবভাবে পুরোদস্তুর গিন্নি। স্কুলে কি গেছোই না ছিল। বিয়ের আগেও তো সারাক্ষণ তিরতির করত ঝরনার মতো। সেই মেয়ে হঠাৎ কেমন ফুলে ফেঁপে উপচে-পড়া নদী। আমার বিয়ের মাস কয়েক আগে ওর বিয়ে হয়েছিল।

—'তুই বেশ আছিস।' নূপুর আমার হাত ধরেছিল,—'দিব্যি কেমন ঝাড়া হাত পা, চাকরি বাকরি করছিস...'

নূপুরের সুখী সুখী চেহারার স্বাস্থ্যবান স্বামীটি বলে উঠেছিল,—'শুধু চাকরি করলেই কি আর সুখে থাকা যায়? জিজ্ঞাসা করো না তোমার বান্ধবীকে, শখ করে কি আর বাইরে বেরিয়েছে।'

নূপুর ঝপ করে বলে বসল,—'ঠিক বলেছ। কী যে বিশ্রী অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল ওর জীবনে। জানিস রাই, আমি সবাইকে তোর কথা বলি। বাবাঃ, ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। হ্যাঁরে, তোর বরটা তোর সঙ্গে আর যোগাযোগ করে না?'

কৃষ্ণনগর থেকেই মনটা তেতো হয়েছিল। একটু রুক্ষভাবেই বলে ফেললাম,—'আমার সঙ্গে অনিমেষের ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

—'সে তো জানি। ওফ্, আজকাল কাগজ খুললেই শুধু বধূহত্যা, বধূনির্যাতনের খবর। তোরটাও তো কাগজে দু-চার লাইন বেরিয়েছিল, তাই না?'

আমার উঠে আসতে ইচ্ছে করছিল ওদের কাছ থেকে। মনে মনে বলেছিলাম, হ্যাঁরে, আমার মতো ঘটনা যে কোনও সময়ে, যে কোনও মেয়ের ঘটে যেতে পারে। তোরও। এই যে তুই আহ্লাদে ফুলে ফুলে উঠছিস, সেও তো স্বামী নামক বটগাছটিকে ভালমতো জড়াতে পেরেছিস বলেই না...'

নূপুর বলল,—'অনেকদিন পর তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগল রে রাই।'

আমারও ভাল লাগছিল রে নূপুর। কিন্তু কেন বারবার খোঁচা মারছিলি? এটা কী ধরনের ভদ্রতা? কথা না থাক, বুড়ো আঙুল নাচিয়ে ঝগড়া কর না ছোট্টবেলার মতো—আড়ি আড়ি আড়ি, কাল যাব বাড়ি...'

নূপুর ক্রিশ্চিনের কথা শুনলে কী বলত? এরকমও যে করতে পারে কোনও মেয়ে, নূপুররা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। আজ বিকেলে ছুটির পর লিফট থেকে নেমেছি, শার্লি চলে গেল ডানদিকে। হেঁটেই ফেরে। স্টিফেন হাউস থেকে ছাতাওয়ালা গলি আর কতটুকু। ডোমাও নেমে ওপারে গেল। মিনিবাস স্ট্যান্ডে সানি অপেক্ষা করছে ওর জন্য স্কুটার নিয়ে। আমি আর ক্রিশ্চিন কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলাম। কদিন আগেও ম্যাথুজ রোজ নিতে আসত ক্রিশ্চিনকে। এখন কত দূরে চলে গেছে। ক্রিশ্চিনকে একটু যেন মনমরা দেখাল। নিশ্চয়ই ওর মনকেমন করছে। ম্যাথুজেরও কি একবারও মনে পড়ে না ওর কথা? আলগাভাবে মেয়েটার কাঁধে হাত রাখলাম,—'কীসে ফিরবে? লেডিজ ট্রামে?'

—'বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছে না। কোথাও একটা যাওয়া যায় কি না ভাবছি।'

—'আমি তোমাকে একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। জোব চার্নকের সমাধি...এত পিসফুল জায়গাটা...'

—'নাহ, তুমি যাও। আ'ইল গো অ্যালোন টু এনি ড্যাম ফ্রেন্ড।'

—'আমি তোমার বন্ধু নই?'

নরম চোখে হাসল ক্রিশ্চিন, —'সিওর। তুমি আমার খুব মিষ্টি বন্ধু।'

—'তা হলে চলো আমার সঙ্গে। একটু ঘুরে বাড়ি ফিরে যাবে।'

—'চলো।' ক্রিশ্চিন আমার আঙুলে আঙুল জড়াল। জনারণ্যের ভেতর দিয়ে আমরা দুজন নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি। শেষ বেলার সূর্য হলুদ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। সেই আলোতে ক্রিশ্চিনের জংলা ছাপ বাসন্তী রং মিডি আরও উজ্জ্বল। সারাদিন গুমোটের পর এলোমেলো বাতাস বইতে শুরু করেছে। হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল যেন সেই মুহূর্তে ডালহাউসি পাড়ায় কেউ নেই। ট্রাম, বাস, মিনিবাস, গাড়ি, এলোপাথাড়ি মানুষজন—কেউ না। কিছু না। কিংবা সবই আছে। চিৎকার। কোলাহল। আমি আর ক্রিশ্চিন শুধু কোনও ম্যাজিকে অদৃশ্য মানুষ হয়ে সমস্ত রকম ভিড় আর শব্দ পার হয়ে চলেছি।

চার্চের পেছনে, সমাধিগুলোর সামনে এসে ক্রিশ্চিনের হাত কপাল ছুঁয়ে বুকে ক্রস্ টানল,—'তোমার এ সব জায়গায় আসতে ভাল লাগে রাই?'

সত্যি কেন যে এখানে বারবার আসি আমি! কাউকে খুঁজতে আসি কি? কোনও বন্ধু? কোনও সমব্যাথী?

ক্রিশ্চিন গোটা জায়গাটা ঘুরে দেখে আবার প্রশ্ন করল,—'হোয়াই রাই? হোয়াই ইউ লাভ দিস প্লেস?'

—'জানি না।' মাথা নাড়লাম,—'আমি বোধ হয় এখানে এসে অতীতকে দেখতে পাই। দেখছ না, এই শহরটার একটা অতীতও কেমন এখানে চুপটি করে শুয়ে আছে।'

ক্রিশ্চিন কী বুঝল কে জানে, নীল চোখ ছড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল আমাকে। পশ্চিম আকাশ থেকে কয়েক টুকরো রোদ এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে ঘাসের শরীর। হলওয়েল মনুমেন্টের দিকে তাকিয়ে ক্রিশ্চিন বলল,—'বাট আই হেট ইংলিশ পিপল। আই হেট ইন্ডিয়ানস টুউ।'

—'কেন ক্রিশ্চিন?'

—'বিকজ উই আর দেয়ার বাইপ্রডাক্টস। নট ফুললি ইন্ডিয়ান, নট ফুললি ইংলিশ...'

—'এটা তোমার ভুল সেন্টিমেন্ট...'

—'নো।' ক্রিশ্চিনের গলায় ঝাঁঝ, —'আই ওন্ট স্টে হিয়ার। আই মাস্ট গো অ্যাওয়ে ফ্রম ইন্ডিয়া।'

—'তা হলে ম্যাথুজের সঙ্গে চলে গেলে না কেন?'

ক্রিশ্চিন এবার চোয়াল শক্ত করল,—'স্টপ টকিং অ্যাবাউট দ্যাট ম্যান। আই ডোন্ট নিড হিম।'

মেয়েটা নিশ্চয়ই মনের কথা কাউকে বলতে পারেনি। কেউ তো বুঝতেই চায়নি। একা একাই সহ্য করছে মনের ভারটুকু! ওকে হালকা করা দরকার। কাছে এসে আরেকটু খোঁচাতে চাইলাম,—'যাই বলো, অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার একটা সহজ সুযোগ কিন্তু হারালে তুমি।'

—'নো। আ' হ্যাভ মিসড নাথিং। আমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি। জানো, ম্যাথুজ আমার একটা কথাও বোঝার চেষ্টা করেনি। শেষের দিকে জোর খাটাতে গিয়েছিল। আমি হয়তো ওর প্রস্তাবই মেনে নিতাম। চলে যেতাম ওর সঙ্গেই। পরে ভেবে দেখলাম বিয়ের আগেই যার সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না...দ্যাখো, সম্পর্ক একবার চিড় খেয়ে গেলে তাকে জোর করে জোড়া লাগানোর চেষ্টা না করাই ভাল।'

—'কিন্তু তুমি তো ওকে ভালবাসো?'

—'সো হোয়াট? ভালবাসা মানে আত্মসমর্পণ নয়। সে যদি আমার ইচ্ছেটাকে বুঝতেই না পারল, আমাকে সম্মান করতেই না জানল, আমি কেন তার কাছে হ্যাংলার মতো যাব?'

—'বলতে চাও ম্যাথুজ তোমাকে ভালবাসত না?'

—'পারহ্যাপস নট। হি ওয়ান্টেড টু ডমিনেট মি।' ক্রিশ্চিন দাঁতে দু ঠোঁট চাপল,—'সেটাই আমাকে সবথেকে বেশি আঘাত দিয়েছে রাই।'

আমি চুপ করে রইলাম। ক্রিশ্চিনও মাথা নিচু করে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর যেন নিজের মনেই বলে উঠল,—'দ্যাখো রাই, জীবনটা এত বিশাল, পৃথিবীটা এত সুন্দর, আর বেঁচে থাকাটা এত আনন্দের, আমি তার সব কিছুই উপভোগ করতে চাই। দাসত্ব নয়। অ্যান্ড নো ব্লাডি কমপ্রোমাইজ উইথ এনিবডি হু ডাসন্ট হ্যাভ রেসপেক্ট ফর মি। হি ট্রায়েড টু ফোর্স মি অ্যান্ড গট এভরিবডিজ সিমপ্যাথি অল বিকজ হি ইজ আ ম্যান। আমিও তাকে বলে দিয়েছি, আমি মেয়ে হতে পারি, বাট আয়াম অলসো আ হিউম্যান বিয়িং। নট আ মিয়ার স্টোন অর ট্রি। যে যা বলবে তাই আমাকে মাথা নিচু করে মেনে নিতে হবে, সরি,

আ'য়াম নট দ্যাট টাইপ অফ চিক।'

ক্রিশ্চিন নয়, যেন কোনও সম্রাজ্ঞী ময়ূরপঙ্খি চড়ে ভেসে যাচ্ছিল আমার বুকের ওপর দিয়ে। অনেকক্ষণ তারপর একসঙ্গে ছিলাম আমরা। এসপ্ল্যানেডে এসে খেলাম কিছু। গল্প করলাম অনেক। একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিল ক্রিশ্চিন। অফিসে যেমন থাকে সব সময়। আমিই কেন যে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম বার বার?

ঘণ্টাখানেকের ওপর হোস্টেলে ফিরেছি। তারপর থেকে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। শাড়িটাও বদলানো হয়নি এখনও। কী যে হচ্ছে আমার ভেতরটায়। বারবার ক্রিশ্চিন ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। শক্তভাবে নিজের কথাগুলো বলার সময় কেন ক্রিশ্চিনের চোখ ভিজে উঠছিল? হয়তো এটাই স্বাভাবিক। যুক্তি আর হৃদয় দুটো নিয়েই তো মন। শিকড়সুদ্ধ গাছ উপড়ে ফেলা সহজ নয়। যদি বা উপড়ে ফেলাও যায়, মাটিতে দাগ থাকবেই।

এখন দোতলাটা ফাঁকা। একদম শুনশান। আমাদের ঘর ছাড়া আর দুটো ঘর তালাবন্ধ। মঞ্জুদি বোধ হয় মন্দির টন্দিরে গেছে। বন্দনাদি কিছু আগে নীচে গেল টিভি দেখতে। পেছনের ভাঙা বাড়ির গাছগুলো ঝিমঝিম হাওয়ায় ভুতুড়ে ছায়ার মতো দুলে উঠছে। জ্যৈষ্ঠ শুরু না হতেই গরম ভাপ উঠতে শুরু করেছে মাটির শরীর থেকে। সামনের বাড়ির আলোগুলো আজ সব নেভানো। ওদিক থেকে একটা চোরা অন্ধকার যেন গড়িয়ে আসছে এপারে। পাড়ার ছেলেরাও এখনও আড্ডায় বসেনি। চারদিক কেমন অদ্ভুত রকম শব্দহীন। আজকের নির্জন সন্ধেতে আমার একা থাকতে একটুও ভাল লাগছে না। কাঁকন তো নিজেকে নিয়েই মশগুল। সিদ্ধার্থও যদি থাকত। ও বোধ হয় আর আমার সঙ্গে কোনওদিন যোগাযোগ করবে না। কেন যে ওরকম নোংরা ব্যবহার করে ফেললাম সেদিন। আমাকেই যেতে হবে...। বড্ড গরম লাগছে। নীচে গিয়ে গা ধুয়ে এলে ভাল হত। ওপরে এসময়ে অত জল পাওয়া যায় না।

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। ঘরে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেলাম। মন্দিরাদি ফিরল নাকি। না হিরণদি! কাঁকন বা শুভ্রা এখন নিশ্চয়ই ফিরবে না। যেই আসুক, একটু কথা বলে বাঁচি। নিজেকে বড় একা লাগছে।

—'কী গো রাই, অন্ধকারে কেন?' ব্রততী বোধ হয় ছাদে উঠেছিল, আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—'এমনিই। তুমি এখন ছাদে যাচ্ছ কী করতে?'

—'আর বোলো না। একে এই গরম, তারপর সবাই মিলে বাংলা সিরিয়াল দেখতে অফিসে জড়ো হয়েছে। যত্ত সব জোলো প্রেমের গল্প।'

—'তাই তুমি হাওয়া খেতে যাচ্ছ?' আমি হাসলাম। আবছা অন্ধকারে ব্রততীর মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। একটু তফাতে শুধু ওর লম্বা ছিপছিপে শরীরের সিল্যুট।

—'তুমিও এসো।' ব্রততী ডাকছে।

—'ভাল্লাগছে না গো ছাদে যেতে। তার থেকে বরং ঘরে এসো। তুমি তো আসই না দোতলায়।'

ব্রততী আমার বিছানায় বসেছে। ছোট আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম,—'তোমার স্কুল কেমন চলছে?'

—'ভালই। আমরা তো ওয়ার্ক এডুকেশনের লোক। স্কুলের ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখি না। স্কুলে যাই, ব্যায়াম শেখাই, চলে আসি। মাঝেমধ্যে অবশ্য দু-একটা ছোটদের ক্লাসও নিতে হয়।'

—'মেয়েরা আজকাল খুব ব্যায়াম করছে?'

—'নিশ্চয়ই। তুমিও করতে পারো। এত সুন্দর ফিগার তোমার। কয়েকটা আসন করলে একেবারে টানটান থাকবে।'

—'যাঃ', একটু লজ্জা পেলাম,—'আমার আবার ফিগার ভাল কোথায়?'

ব্রততী ঝপ করে আমার হাত ধরে টানল,—'নিজের দর বাড়াচ্ছ? তুমি নিজেই জানো না রাই তুমি কী। তোমার চোখ দেখলে যে কেউ পাগল হয়ে যাবে।'

হাতটা শক্ত করে ধরে আছে। ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারলাম না। আস্তে আস্তে চাপ দিচ্ছে তালুতে। মুহূর্তে মন বিষিয়ে গেল। কী চাইছে বুঝতে পারছি। মেয়েতে মেয়েতে শরীরের খেলা! ছিঃ। সাধে কি মন্দিরাদিরা একে দুচক্ষে দেখতে পারে না। মেয়েটাকে ঘরে ডাকাই ভুল হয়েছে।

—'ছাড়ো। চলো ছাদে গিয়ে বসি।'

—'ছাড়তে ইচ্ছে করছে নাগো। তোমার হাতটা কী নরম।' ব্রততীর চোখদুটো অন্যরকম হয়ে গেছে। যেন মানুষের নয়, সাপের চোখ। গা ছমছম করে উঠল। ভয় করছে আমার। হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিলাম,—'এ সব আমার ভাল লাগে না ব্রততী। বসে গল্প করো না প্লিজ।'

সঙ্গে সঙ্গে সাপের মতো ফুঁসে উঠেছে ব্রততী। গোটা মুখ অপমানে লাল, হিসহিস করছে গলার স্বর—'তবে কি ছেলেরা হাত ধরলে তোমার ভাল লাগে? একবার ঠোক্কর খেয়েও শিক্ষা হয়নি? পুরুষেরা কোনওদিন মেয়েদের ভালবাসতে পারে না। মেয়েরাই মেয়েদের ভালবাসতে জানে।'

—'বাজে কথা। এটা তোমার অসুখ।'

—'চুপ করো। কতটুকু জানো তুমি আমার সম্পর্কে? অনেক পুরুষ ঘেঁটেছি আমি। ওরা মেয়েদের শুধুই ভোগ করতে চায়। শক্তি দিয়ে। মেয়েরাই জানে কীভাবে নরম করে আদর করতে হয়।' ব্রততী আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বুক থেকে আমার আঁচল টেনে ফেলে দিল।

সরে যাওয়ার আগেই সজোরে জাপটে ধরেছে, অজস্র চুমু খেতে শুরু করেছে আমার ঠোঁটে, গালে, কপালে। মাথার ওপর ঘটাং ঘটাং শব্দে ঘুরে চলেছে ফ্যানটা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি যেন প্রতিরোধ হারিয়ে ফেললাম। তারপরই প্রচণ্ড শক্তিতে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছিটকে এসেছি বারান্দায়,—'তুমি চলে যাও ব্রততী।'

মেয়েটা হনহন করে নেমে যাচ্ছে। ওর দিকে আমার তাকাতেই ইচ্ছে করছে না। প্রবল বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। আমি কখনও ব্রততীর মতো হতে চাই না। রীতা, কৃষ্ণা বা বউদিদের ঘরের মাদ্রাজি মেয়েটার মতোও না। আমি কোনওদিন বড়দি ছোড়দি হব না। ভালভাবে বাঁচতে চাই আমি। স্বাভাবিক মানুষের মতো...

একা একা থরথর করে কাঁপছি। অনেকদিন পরে কেউ ওভাবে শরীর ছুঁল আমার। ব্রততী নীচে নেমে যাওয়ার পর কেমন একটা বিশ্রী কষ্ট হচ্ছে। শরীর ভেঙে হঠাৎ অকারণ ঝড় উঠছে কেন? নিজের এই বিদ্রোহী শরীরকে আমি চিনি না। তবে কি ভেতরে ভেতরে শরীর কারুর স্পর্শ চাইছিল, এরকমই? কে সে? নীলাঞ্জন? সিদ্ধার্থ? জানি না, জানি না, জানি না। এ কী হল আমার?

দুহাতে মুখ ঢেকে বিছানায় আছড়ে পড়েছি। হে ঈশ্বর, এখখুনি যে কেউ একজন এসে পড়ুক ঘরে। মন্দিরাদি, শুভ্রা, হিরণদি যে কেউ...

এগারো

চারদিক ধোঁয়া করে তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। এক হাত দূরের কিছু দেখা যায় কি যায় না। কোটি কোটি ঘষা কাচের টুকরো যেন অবিরাম আছড়ে পড়ছে মাটিতে। আকাশের প্রবল শব্দে স্তব্ধ পৃথিবীর সব কোলাহল। দুরন্ত সেই বৃষ্টি ভেঙে একা একা পথ চলছিল মেয়েটা। ধু ধু মাঠে সে ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই। মাঠের শেষে এক বিশাল কাচের ঘর। ভয়ানক দুর্যোগ পেরিয়ে মেয়েটাকে পৌঁছতেই হবে ওখানে। দূর থেকে ঝাপসা দেখা যায় ঘরটার ভেতর রাজকীয় চেয়ারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে কিছু গোমড়ামুখ মানুষ। তারা কেউ কোনও কথা বলছে না। শুধু বেল বাজাচ্ছে ঘন ঘন। তীক্ষ্ণ সেই ধাতব শব্দ আর মেঘের গর্জন মিলেমিশে একাকার। মেয়েটা আরও তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করল। ভিজে শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে, কপাল বেয়ে অঝোর বৃষ্টি। তীব্র ঝলক ছিটিয়ে খলখল হেসে উঠল বিদ্যুৎ। মেয়েটা দুহাতে মুখ ঢাকল। কোনওভাবেই কি তবে ওপারে পৌঁছনো যাবে না? সে দৌড়োনোর চেষ্টা করল; ঝড় তাকে আছড়ে ফেলল মাটিতে। চিৎকার করে কাউকে ডাকতে চাইল; কোনও শব্দই বেরোল না গলা থেকে। অন্ধকার মিহি থেকে গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। আর কোনওদিন বুঝি সূর্য উঠবে না পৃথিবীতে।

—'তুমি বড় প্যান প্যান করে কাঁদো।'

কে বলল কথাটা? চেনা গলা যেন? মেয়েটা চমকে তাকিয়েছে। আরে, মেয়েটা যে আমিই। মুখ থুবড়ে পড়ে আছি কাদায়, আগুন রং বেনারসি কাদা জলে চুপচুপ।

—'কথা না শুনে চললে মুখ ছিঁড়ে নেব তোমার।'

আবার দু হাতে মুখ ঢেকেছি আমি, নোংরা পাঁকে ডুবে আছে শরীর। দূর থেকে আরেকটা শব্দ ভেসে এল। কেউ বুঝি নাম ধরে ডাকছে আমাকে, রাআআই, রাই...। মাথা তুললাম। কাছে আরও কাছে এগিয়ে আসছে সেই অপার্থিব আহ্বান, রিন রিন সুর উঠল বুকে। নিকষ অন্ধকারের দিকে হাত বাড়ালাম,—'কে তুমি? কোথায় তুমি?'

মেঘ কেটে সূর্য ওঠার মতো স্বপ্নের পুরুষ স্পষ্ট হচ্ছে। যেখানে তার পা পড়ে, বৃষ্টি থেমে যায়, আলো ফুটে ওঠে। উঠে দাঁড়াতে গেলাম, গাঁটছড়ায় টান পড়ল। অনিমেষের সিল্কের জোড়ের সঙ্গে বাঁধা চুমকি বসানো ওড়না টান টান। বড় শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে ছোটপিসি।

রহস্যময় পুরুষ সামনে দাঁড়িয়ে। পেছনে অনিমেষের রাগী গলা, —'কোথায় যাচ্ছ? ঘরে এসো বলছি।'

—'যাব না।'

—'তোমাকে যেতেই হবে।'

—'কখ্খনও না।' আমি সামনে হাত বাড়িয়ে দিলাম,—'আমাকে তুমি নিয়ে চলো নীলাঞ্জন।'

নীলাঞ্জনের ঠোঁটে চাপা হাসি, চোখ বেয়ে ঝরছে ভালবাসার ঝরনা। সে আমাকে উঠিয়ে নিল কাদা থেকে। এবার দুধারে শুধু গাঢ় সবুজ বন। হালকা নীল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে নীলাঞ্জনের বাদামি ঘোড়া। জোরে, আরও জোরে। শক্ত হাতে লাগাম ধরেছে নীলাঞ্জন; গায়ে তার মধ্যযুগের নাইটদের মতো লোহার পোশাক, শিরস্ত্রাণের ফলা ঝলমল। আমি তার চওড়া কাঁধে মাথা রাখলাম,—'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

—'যেখানে তুমি যেতে চাও।'

—'কোথায়?'

—'পাহাড় চূড়ায়।'

—'কী আছে সেখানে?'

—'আকাশ, মেঘ...'

—'আর মাটি নেই? নদী? সবুজ নরম ঘাস?'

নীলাঞ্জন নিঃশব্দে হাসল। ছুটছে, ঘোড়া ছুটছে। জঙ্গল শেষে তিনটে খাড়া পাহাড়। একটা পাহাড় পেরিয়ে গেল। আরেকটাও। এবার তৃতীয় পাহাড়ে উঠছে ঘোড়া, পাকদণ্ডি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটা বাড়ি। ঘোড়া সেখানে এসে থামল। কিন্তু একী! এ তো আবীরের ফ্ল্যাট! কাঁকনের সঙ্গে এ ফ্ল্যাটে এসেছি আমি। এইমাত্র যে জঙ্গলটা পেরিয়ে এলাম তার ছবি ঝোলানো আছে আবীরেরই ড্রয়িং রুমে। এখানে আমরা কেন? নীলাঞ্জন দরজা খুলে ধরল,—'এসো রাই।'

এতক্ষণে সংবিৎ পেয়েছি, —'না নীলাঞ্জন, আমি যেতে পারি না। আমাকে ফিরতে হবে।'

—'এখানে এলে আর ফেরা যায় না রাই।'

—'আমাকে ফিরতেই হবে। আমার যে আজ ইন্টারভিউ...'

পাগলের মতো এলোপাথাড়ি ছুটছি। নীলাঞ্জন কোথ্থাও নেই। আবার ঝমঝম বৃষ্টি নেমেছে। সেই বৃষ্টিতে আবার অনিমেষের গলা, —'চাকরি তোমার হবে না।'

—'অসম্ভব। আমি পাবই।'

অনিমেষ আমার কাঁধ খামচে ধরল। ঝাঁকাচ্ছে...ঝাঁকাচ্ছে...

—'এই রাই ওঠ, শিগগিরি ওঠ, কাকলিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

চমকে তাকিয়েছি। বন্দনাদি জোরে জোরে ঠেলছে, —'কী ঘুম রে বাবা তোর। গোটা হোস্টেল কখন জেগে গেছে...'

অদ্ভুত স্বপ্নটা এখনও লেগে আছে চোখে। কোনও কথাই মাথায় ঢুকছে না। বন্দনাদি দৌড়ে জানলার কাছে চলে গেল। রাস্তার দিকের তিনটে জানলায় দাঁড়িয়ে আরও অনেকে, মন্দিরাদি, মঞ্জুদি, শেফালি, দীপ্তি...শুভ্রাও। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি। এই বৃষ্টিই...তা হলে এতক্ষণ আমার স্বপ্নের ভেতর...। লাফ দিয়ে সুকৃতির কাঁধের পেছনে পৌঁছে গিয়েছি, —'কী হয়েছে কাকলির?'

বন্দনাদি জানলা থেকে মুখ ফেরাল। উত্তেজনায় ফুটছে, —'উফ, মাঝরাত থেকে নীচে সে কী

হুলুস্থুল কাণ্ড। লুকিয়ে লুকিয়ে কোত্থেকে কাল অ্যাবরশন করিয়ে এসেছিল...ব্যস, হঠাৎ শুরু হয়ে গেছে ব্লিডিং...'

—'কী রক্ত, কী রক্ত...' দীপ্তির মুখ ভেঙেচুরে গেল,—'আর বোধ হয় একফোঁটা রক্তও নেই মেয়েটার শরীরে...'

—'যন্ত্রণায় কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছিল। এই তো ভোর হতে পাড়ার ডাক্তার এল।'

আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ঘরের সকলে কথা বলছে। প্রবল বৃষ্টির শব্দে মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে ওদের গলা। কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না। স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছি শুধু। কাকলির জন্য কি তবে এই পরিণতিই অপেক্ষা করছিল?

নীচে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার আওয়াজ। ওপরের সকলে আবার হুড়মুড় করে জানলায়। ছোড়দি আর বউদি ধরাধরি করে কাকলিকে পেছনের সিটে তুলছে। বুলবুল ছাতা ধরে আছে পেছন থেকে। থপথপে শরীর নিয়ে বড়দি ভিজে ভিজেই বেরিয়ে এল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। গুমগুম মেঘ ডেকে উঠল। বড়দি ওপর দিকে মুখ তুলে ডাকছে, —'মন্দিরাদি, আপনি যাবেন নাকি? গেলে ভাল হয়।'

মন্দিরাদি জানলা থেকে সরে এল,—'মাথা খারাপ। ওই কেস নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে মরি আর কী! ও সব ঝামেলায় আমি নেই।'

ট্যাক্সির সামনে ছাতার ভিড়। এই বৃষ্টির ভোরে ভাগ্যিস পাড়ার লোকেরা এখনও জাগেনি। কাকলিকে নিয়ে ছোড়দি আর বউদি চলে গেল। ঘন আকাশ মাথায় নিয়ে এই মাত্র গলির মুখ ঘুরে গেল ট্যাক্সি। আর কারুর কি যাওয়ার দরকার ছিল! ইচ্ছে করছে এক ছুটে নীচে নেমে যাই। কী করে যাই? আমার পা দুটো যে নিথর হয়ে গেছে। তা ছাড়া আজই আমার ইন্টারভিউ ক্যামাক স্ট্রিটের অর্জুন ট্রাভেলস-এ। কটা বাজল এখন? বেলা বোঝা যাচ্ছে না। জারুল গাছের মাথায় চড়ে তাণ্ডব নাচ নাচছে আকাশ। শীত করছে আমার। শরীর কাঁপছে অল্প অল্প। ভাল করে আঁচল জড়িয়ে নিজের বিছানায় বসে পড়লাম। চারদিকে জমাট স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা। হাত বাড়িয়ে র‍্যাক থেকে ঘড়ি পাড়লাম। নাহ্, বেলা বেশি হয়নি। সবে ছটা দশ।

শুভ্রা প্রথম ফিরল জানলা থেকে। নিজের মনে বিড়বিড় করছে, —'বোকা, বোকা, রামবোকা মেয়েটা। এমন ভুল কেউ করে! আশ্চর্য!'

হিরণদি বিছানায় গা ছেড়ে দিল,—'আমাকেও যদি বলত...আমাদের নার্সিং হোমে তো আকছার এ ধরনের কেস...'

—'আমাদের নার্সিং হোম আবার এ ব্যাপারে ভীষণ স্ট্রিক্ট। গার্জেনের পারমিশন ছাড়া...'

—'গার্জেন একটা কাউকে সাজিয়ে নেওয়া যায়...মেয়েটা কোথায় কী করাতে গিয়েছিল কে জানে...'

—'বড়দি ঠেলা বুঝবে।' বন্দনাদি হাঁটু মুড়ে চৌকিতে বসল,—'তখনই বলেছিলাম এ সব মেয়েকে হোস্টেলে রাখা উচিত নয়। কেন যে থাকতে দিল!'

—'কাকলির জ্যাঠামশাই যে উকিলবাবুর বন্ধু। উনি নাকি বড়দিকে বলে গিয়েছিলেন মেয়েটার ওপর নজর রাখতে।'

—'আহা মেয়ে যেন কচি খুকি। বড়দি ধমকালেই গর্তে ঢুকবে!'

—'তা কেন? পাঁচজনের সঙ্গে থাকলেও তো নিজেকে সংশোধন করে নেওয়া যায়। আমাদের সবাইকে দেখেও তো ও...'

—'ভুল করছেন। মেয়েটা আসলে বেসিকালি খারাপ।'

—'অথচ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। কী সরল প্রতিমার মতো মুখ...'

মঞ্জুদি ছোঁওয়াছুঁয়ির বাতিক ভুলে হিরণদির বিছানায় বসে পড়েছে। মুখচোখে হায় হায় ভাব, —'এখানে যখন প্রথম এসেছিলাম, কী সুন্দর পরিবেশ ছিল...'

—'যা বলেছেন।' বন্দনাদি চা আনতে যাওয়ার জন্য তাক থেকে কাপ নামাচ্ছে, —'মান বাঁচিয়ে এ হোস্টেলে আর বেশিদিন থাকা যাবে না। অন্য কোথাও...'

—'আমি বাবা গরমেন্ট হসপিটালে চাকরি পেয়ে যাচ্ছি। ভাল কোয়ার্টার পাব।' শেফালি আড়মোড়া

ভেঙে নিজের ঘরে চলে গেল। ও ঘরে আজ কাঁকন নেই। কালই বালুরঘাট গেছে।

—'মেয়েটাকে আর এরপর এখানে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।'

—'দাঁড়ান, আগে বেঁচে ফিরুক তো।'

কাকলি কি মরে যাবে? সারা শরীর শিরশির করে উঠল আমার। সবাই কত হালকাভাবে কাকলিকে নিয়ে আলোচনা করছে। আমি কেন কিছুতেই পারছি না সহজ হতে? কেন কাকলি সুযোগ পেয়েও ফিরতে পারল না সুস্থ জীবনে? তবে কি ফেরা যায় না? তোলার সময় নীচের বউদি গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরেছিল কাকলিকে। ওই মহিলারই বা জীবনের ফাঁক কোথায়? কিংবা শুভ্রার? জানলা থেকে সরে আসার পর শুভ্রা সোজা বাথরুমে চলে গিয়েছিল। তারপর ফিরে আয়না নিয়ে সাজতে বসেছে। এই বৃষ্টিতেও কি আজ বেরিয়ে যাবে শুভ্রা? কোথায় যায়? হয়তো সত্যি অফিসে যায়, আমাদেরই মতন। যতই বৃষ্টি হোক, আমাকেও তো বেরোতে হবে আজ।

মন্দিরাদি চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। চা আনতে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি ধরে এলেও অজস্র জলের ধারায় বারান্দা ভাসছে। এলোমেলো জলে টুকরো কাগজ, শুকনো পাতা। নীচের নর্দমা বেয়ে খরস্রোতা কাদাজল। একটু আগে স্বপ্নে ওই কাদাতেই হাবুডুবু খাচ্ছিলাম আমি। নোংরা কাদার দিকে তাকিয়ে মন্দিরাদি কী ভাবছে? কাকলিকে নিয়ে হাসপাতালে যেতেও রাজি হল না, ঘরের মহিলামহলেও নেই, ব্যাপার কী? কারুকে নিয়ে চর্চা চলছে অথচ মন্দিরাদি নেই, এ ভাবাই যায় না।

—'চা খাবেন না?'

মন্দিরাদি ভুরু কুঁচকে তাকাল,—'কাকলির জন্য আমি নারী সেবা সমিতিতে বলে একটা পার্টটাইমের ব্যবস্থা করেছিলাম। গেল না মেয়েটা। ও সব বাজে মেয়েদের জন্য কখ্খনও কিছু করতে নেই।'

কাঁকন থাকলে বলত—ঠিক হয়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে আপনার। আরও যান পরের ব্যাপারে নাক গলাতে।

—'মেয়েটা কী হাতে পায়ে ধরেছিল একটা কাজ জোগাড় করে দেওয়ার জন্য। তখনই বোঝা উচিত ছিল বাঘিনী কোনওদিন বোষ্টমী হতে পারে না।'

শুভ্রা প্লাস্টিকের বালতিতে জল আনতে বেরিয়েছে। আমাদের দেখে মুখ বেঁকাল,—'কী রাই, কাকলিকে নিয়ে গবেষণা এখনও শেষ হল না?'

দপ করে মাথা জ্বলে উঠল। কোনওদিন যা করিনি, তাই করে ফেললাম। চিৎকার করে বলে উঠলাম,—'তুমি একটাও কথা বলবে না এর মধ্যে।'

শুভ্রাও সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠেছে, —'কেন? কথা বলার অধিকার শুধু তোমাদেরই আছে নাকি?'

—'হ্যাঁ তাই। তোমার মতো মেয়ের এখানে কথা বলা সাজে না।'

—'যাও, যাও। সবারই সব চরিত্র জানা আছে আমার।'

মন্দিরাদি আমার হাত ধরে টানল,—'চুপ কর রাই। ওর সঙ্গে কথা বলে নিজেকে ছোট করিস না।'

—'কেন চুপ করব? শরীর বেচা ছাড়া আর কোনওভাবে রোজগার করা যায় না? কোনও উপায় না থাকলে, অনেক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আছে, হোম আছে, সেখানে যেতে পারে। নিরাশ্রয় মেয়েদের জন্যও তো...'

—'কে বলেছে আমি নিরাশ্রয়?' শুভ্রার গলা বিকৃত হয়ে গিয়েছে, —'কতটুকু জানো তুমি আমার সম্পর্কে? বড় বড় কথা বোলো না। মেয়েদেরকে তেল নুন সাবানের বেশি কেউ দাম দেয় না, বুঝলে। ছেলেরাও আমাদের এক্সপ্লয়েট করে, আমরাও ছেলেদের এক্সপ্লয়েট করি। বেশ করি।'

—'বা, বা, চমৎকার যুক্তি...'

—'হ্যাঁ তাই, তোমাদের মতো ভাবের ঘোরে চলি না আমি।' শুভ্রা হাঁপাচ্ছে, —'নীচের বউদিকে দ্যাখো না? নিজে অক্ষম বলে স্বামী এক মালদার পার্টির সঙ্গে জুতে দিয়েছে বউকে। তার হুকুমে বউদিকে ছেলে মেয়ে ছেড়ে হোস্টেলে এসে থাকতে হয়। আর কাজকর্ম শেখার কথা বলছিলে না? আমার বাবা চায় আমি আমার বসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এভাবে তাকে টাকা এনে দিই। তাকে আনন্দে রাখার জন্য এখান সেখান বেড়াতে যাই। কী বুঝলে?'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে তুমি যাও তোমার কাজে।'

—'যাব তো বটেই। তার আগে আরেকটা কথাও বলে যাই। আমি কেপ্টই হই আর বউই হই, সবসময়ে ভোগেরই বস্তু। অতএব যতদিন বাঁচব, ছেলেদের স্কুইজ করব। করবই।'

সমাজের বিরুদ্ধে এ কী হিংস্র প্রতিবাদ শুভ্রার? আমি পাথর হয়ে গেছি। কোনওদিন কি কোনও ভাল লোক দেখেনি শুভ্রা? কখনও ভালবাসা পায়নি? কত মেয়েকে এরকম ভালবাসাহীন হয়ে বেঁচে থাকতে হয়? শুভ্রাকে করুণা করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। কিছু কিছু মেয়ে কোনওদিনই পৃথিবীর উজ্জ্বল দিকটা দেখতে পায় না।

শুভ্রা গটগট করে ঘরে ঢুকে গেল। চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে। ওর এত রাগ কার ওপর? কার প্রতি এত ঘৃণা?

দোতলার সব বোর্ডার বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। বন্দনাদি লাফিয়ে আমার কাঁধ চেপে ধরল,—'ঠিক করেছিস রাই। খুব ভাল করেছিস। ওকে এরকম সোজাসুজি বলার দরকার ছিল।'

দু আঙুলে কপাল চেপে ধরলাম। শিরাগুলো সব ছিঁড়ে পড়বে যেন। এ কী করলাম? কারুর সঙ্গে এভাবে ঝগড়া করিনি কোনওদিন।

মঞ্জুদি পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে, —'কিছুতেই হাতেনাতে ধরা যাচ্ছিল না। খালি পিছলে পিছলে যায়। এবার যদি ওকে হোস্টেল থেকে তাড়ানো না হয়...'

—'হ্যাঁ, সবাই মিলে উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলব। আজই সমস্ত নোংরা সাফ করতে হবে এখানকার।'

সবাইকে ছাড়িয়ে নীচে নেমে গেলাম। দম বন্ধ হয়ে আসছে। ছেলেরা নয়, মেয়েরাই মেয়েদের সবথেকে বড় শত্রু। বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দিয়েও আমরা মেয়েরাই আরেকটা মেয়েকে বিচার করতে নারাজ। যুক্তি দিয়ে বোঝার আগে আমরা সমালোচনা করতে শিখি। শিক্ষা না কুশিক্ষা?

খাবার প্যাসেজে চা নিয়ে বসেছি। মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে কাকলিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এর মধ্যেই সব রোজকার মতোই স্বাভাবিক। মনেই হয় না, এ বাড়িরই একজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে এখন। বুলবুল ঘরে টেপ বাজাচ্ছে। গান শুনতে শুনতেই ঝগড়া করছে শর্বরীর জায়গায় আসা নতুন মেয়েটার সঙ্গে। মেয়েটা নাকি রোজ ওর ব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে রাখে। মধুছন্দা আর তামিল মেয়েটা অফিস বেরিয়ে গেল। কৃষ্ণা, মিনতিরাও তৈরি হচ্ছে। দীপ্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়েই বেরিয়ে গেল। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ম্যাসাজিং-এর কাজ করে। ব্রততী স্নান সেরে সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়, আমার মুখের কাছে মুখ এনে ফুঁ দিয়ে চলে গেল। চা শেষ না করেই উঠে দাঁড়ালাম। গোটা মুখ বিস্বাদ হয়ে গেছে। নাহ্! কাকলির জন্য কোথাও কিছু থেমে থাকবে না। দুনিয়া তার নিয়মমতোই চলে। আমাকে দশটা নাগাদ বেরোতে হবে। সাড়ে এগারোটায় ইন্টারভিউ।

বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে। নীরব কান্নার মতো মোটা মোটা দানায় ঝরছে এখন। পেছনের ভাঙা বাড়ির গাছগুলির সবুজ হঠাৎ ভিজে ঝকঝকে। বারান্দায় দু-এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ঘরে এলাম। শুভ্রা বেরিয়ে গেছে। বেচারির আজ আমার জন্য সাজগোজ করা হল না! মন্দিরাদি বাথরুমে। বন্দনাদি খবরের কাগজ পড়ছে আর মঞ্জুদি যথারীতি চৌকিতে পাতা কম্বলের আসনে। বউদি ছোড়দি এখনও ফিরল না কেন? হিরণদিকে প্রশ্নটা করতে যাওয়ার আগেই হিরণদি আমার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে উঠল,—'দেখলে তো রাই, থেমে গেল বৃষ্টিটা। আরেকটু হলে কী ক্ষতি হত?'

—'আপনার ডিউটি নেই?'

—'সেই কথাই তো বলছি! মাঝরাত থেকে জেগে আছি, ভাবলাম বৃষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ডুব মেরে দিই। আকাশ কেমন হতচ্ছাড়া দ্যাখো...'

—'বেরোবেন তা হলে?'

—'দুর, আর গিয়ে কী হবে? মরনিং শিফটের সময় পেরিয়ে গেছে। ভালই হল বুঝলে। কদিন ধরে এক বুড়ো খুব জ্বালাচ্ছে। ইসকিমিয়ার পেশেন্ট, ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি, ঘুমো আরামসে তা নয়, সারাক্ষণ খিচকিচ, বকবক...আগের জন্মে অনেক পাপ করলে এ জন্মে নার্স হতে হয়।'

—'যাঃ, আপনারা কত পুণ্যের কাজ করেন।'

—'পুণ্য না ছাই। রুগি ঘটিতে ঘটিতে ঘেন্না ধরে গেল। একেকটি পেশেন্ট একেক টাইপ। কত রকম যে বায়নাক্কা...'

—'বারে, অসুস্থ লোক একটু তো অবুঝ হয়ই।' কথাটা বলতে না চেয়েও বলে ফেললাম। আর বাদানুবাদ ভাল লাগছে না। হিরণদি আমার কথা বুঝবে না, আমিও বুঝব না হিরণদিকে। রোগ আব মৃত্যু দেখতে দেখতে ডাক্তার নার্সরা এরকমই মানুষ সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে যায়। এই নিস্পৃহতা মেনে নিতে কষ্ট হয় আমাদের।

চৌকির তলা থেকে সুটকেস বার করলাম। আজ জংলাছাপ পিওর সিল্কটা পরব। সিদ্ধার্থ বলে এই শাড়িটাতে আমাকে নাকি খুব সুন্দর দেখায়।

দিনটাই আজ খারাপ। অর্জুন ট্রাভেলস্-এর পরিবেশ আমার একদম পছন্দ হয়নি। মালহোত্রা ব্রাদার্সের চেয়েও ছোট্ট খুপরি অফিস। মাইনে অবশ্য ওখানকার থেকে কিছু বেশি। মাত্র ছজনকে ডেকেছিল এরা। এত কম প্রতিযোগী এর আগে পাইনি। আচ্ছা, আমার পাশে যে মেয়েটি বসেছিল, নিরীহ চেহারা, ওর কি খুব বেশি দরকার চাকরির? ইন্টারভিউ দিতে ঢোকার আগে ঠকঠক করে কাঁপছিল। আহা, ওরই যেন কাজটা হয়ে যায়। এরা এত কম মেয়েকে ডেকেছিল কেন? নাকি আগে আরও...? যেখানেই কাজের জন্য যাই, থরে থরে তো মেয়ে এসে বসে থাকে! এত মেয়েরও চাকরির দরকার। এই যদি অবস্থা হয়, লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলেগুলোর কী হবে! ভাগ্যিস দাদা সময় মতো ব্যাঙ্কে ঢুকতে পেরেছিল, কৃষ্ণনগরেই। ভাইয়ার কপালে কী আছে কে জানে। একদম পড়াশুনোয় মন নেই, দিনরাত নাটক নিয়ে ব্যস্ত! আমার ভাই না হয়ে ওকে কাঁকনের ভাই হলে মানাত ভাল।

ফুটপাথে নেমে ছাতা খুলে নিলাম। আবার টিপটিপ বৃষ্টি নেমেছে। আকাশের গায়ে সিসে রং মেঘ। এতক্ষণ ভেতরে বসে টেরই পাইনি কখন আবার কালো হয়ে এসেছে দিনটা। বেরোনোর মুখে দিব্যি রোদ উঠেছিল। মৌসুমি বায়ু বোধ হয় এবার তাড়াতাড়ি চলে এল। বাস রাস্তায় পৌঁছতে বেশ কিছুটা যেতে হবে। ভেজা রাস্তায় পা টিপে হাঁটছি। ঠিক সাড়ে দশটায় এখানে পৌঁছেছিলাম, এখন একটা পনেরো। আশপাশের অফিস থেকে অনেকে টিফিনে বেরিয়ে পড়েছে। চওড়া রাস্তা বেয়ে হুশহাশ গাড়ি ছুটছে। কতরকম মানুষ আর গাড়ি যে আছে এই শহরটায়। বেজায় চালিয়াত মার্কা একটা মেয়ে আজ এসেছিল ইন্টারভিউ দিতে। যেমন উগ্র সাজপোশাক তেমনই কথা বলার ধরন। ওর যেন একদম চাকরিটা না হয়। কিংবা কে জানে ওকেই হয়তো পছন্দ করবে অর্জুন ট্রাভেলস-এর মালিকরা। লোকগুলো বেশ আজব। আগে কোনও ইন্টারভিউতে কেউ এরকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেনি আমাকে। কাজের প্রশ্ন না করে একগাদা শুধু উলটোপালটা কথা জিজ্ঞাসা করে গেল। যিনি মাঝের চেয়ারে বসে ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন মনে হয় উনিই সর্বেসর্বা। ভদ্রলোকের চেহারা হুবহু ইতিহাস বইয়ের নেপোলিয়ানের মতো। গাঁট্টাগোট্টা মুখ, মাথাজোড়া টাক, ঠোঁটের কোণে পাইপ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন। অন্য দুজন পার্টনার টাটনার হবে। আর যে ভদ্রলোক নাম ডেকে ডেকে আমাদের ভেতরে পাঠালেন তিনি নির্ঘাত বড়বাবু। ধবধবে সাদা ফুলশার্টের গলার বোতামটা পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন। এই সব মানুষেরা একটু খিটখিটে ধরনের হয়। খয়েরি শাড়ি পরা মেয়েটির সঙ্গে তো জোর একচোট তর্ক করে নিলেন। কিনা পদবির বানান নাকি ঠিক লেখা হয়নি। মেয়েটি অসহায় ভাবে বলল,—'আমরা তো ওই বানানই লিখি স্যার।'

—'ভুল লেখেন, ভট্টাচার্য বানানে সবসময় দুটো ওয়াই হয়।'

—'একটাও তো হয় স্যার।'

এরপর ভদ্রলোক এমন ভাবে তাকালেন যেন ওই অপরাধেই এখখুনি মেয়েটির প্রার্থীপদ বাতিল করে দিতে পারেন, —'দুটো ওয়াই লিখবেন। সেটাই ঠিক।'

কিছু লোক জোর করে এভাবেই নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। বসেদের ঘরে ঢুকলে তাদের রূপ আবার অন্যরকম। ভদ্রলোক আমার ইন্টারভিউ-এর সময় এমন ভাবে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেন অফিসের হেডপিয়ন। নাহ্, আজ পরীক্ষা দিতে গিয়ে একটুও ঘাবড়াইনি, অন্যান্যবারের মতন সকালের পর পর ঘটনাগুলো মনকে বড় বেশি ঘিরে রেখেছে। কেমন অবশ হয়ে আছে মাথাটা। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন,

—'আপনার নাম রাইকিশোরী চৌধুরী?'

—'হ্যাঁ স্যার।'

—'মালহোত্রা ব্রাদার্স ছাড়তে চান কেন?'

চেনা প্রশ্ন। গড়গড় করে প্রতিবারের মতো উত্তর দিলাম,

—'বেটার প্রস্পেক্টের জন্য।'

পাশ থেকে একজন প্রশ্ন ছুড়ল,—'আপনি নিশ্চয়ই আনম্যারেড?'

অস্বস্তি বোধ করলাম। এরকম প্রশ্ন কেন? বিবাহিত মেয়েদের কি এরা চাকরি দেবে না? বিজ্ঞাপনে সেরকম তো লেখা ছিল না। ঠোঁটের ডগায় মিথ্যে এলেও বলতে পারলাম না, সোজাসুজি তাকালাম,—'না আমি ডিভোর্সি।'

—'আই সি।' নেপোলিয়ন মাথা নাড়লেন। অন্য দুজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিল।

—'এনি ইস্যু?'

—'না।'

—'একা থাকেন?'

—'না। লেডিজ হোস্টেলে থাকি।'

অত এতাল বেতাল প্রশ্ন করছিল কেন ওরা? চাকরির সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কী?

বাসস্টপে এসে মনস্থির করে ফেললাম। এ চাকরি আমার দরকার নেই। আমার ঠিক সামনেই শেডের নীচে একটা হাঘরে পরিবার সংসার পেতে বসেছে। মা নির্বিকার মুখে পা ছড়িয়ে উকুন বাছছে আর ময়লা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরা কিশোর ছেলে, ল্যাংটো ভাইকে কোলে নিয়ে, স্টপে দাঁড়ানো মানুষজনের কাছে নীরবে হাত পেতে দাঁড়াচ্ছে। আমার সামনে এসেও ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। এবার ব্যাঙ্কের দেওয়াল থেকে সিনেমার পোস্টার ছেঁড়ায় মগ্ন। রাজীব গান্ধীকে স্কন্ধকাটা করে জ্যোতি বসুর মুণ্ডু ছিঁড়ছে। রাজনৈতিক পোস্টার দুটোর মাথায় হিন্দি ফিল্মের দিগম্বরী নায়িকা। একবার ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'পলিটিকসে আগ্রহ আছে? কোন পার্টিকে সমর্থন করেন?' বলেছিলাম,—'রাজনীতি বুঝি না স্যার।'

—'সেকী দেশের খবর রাখেন না?'

হায়রে, রাজনীতি আর দেশের খবর যদি এক হত! রাজনীতি চলে তার নিজের চালে। দেশ চলে যেমন চলছে। কিন্তু আমি এখন চলি কোথায়? অযথা আবার একটা দিনের মাইনে কাটা গেল। হোস্টেলে ফিরতে ভয় করছে। কী জানি কাকলির কী খবর! তার থেকে বরং একটা দুর্দান্ত সাহসী কাজ করে ফেলি। এতদিন পরে ফোনে আমার গলা পেয়ে ভীষণ অবাক হয়ে যাবে সিদ্ধার্থ। খুব সহজভাবে জিজ্ঞাসা করব—'এখনও রাগ করে আছেন? এত অভিমান আপনার?'

সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই প্রথমটা উত্তর দেবে না। তখন বলব...কী বলব? আমার অন্যায় হয়ে গেছে? না, কোনও পুরনো প্রসঙ্গ নয়, বলব, —'এখ্খুনি চলে আসুন রবীন্দ্রসদন স্টেশনের মুখে। আমি অপেক্ষা করে আছি।' তারপর...তারপর।

মনে মনে কথার পর কথা সাজাচ্ছি আর সাজাচ্ছি, হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়তেই শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। দূর থেকে কে আসছে এদিকে এগিয়ে? মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেল...আবার দেখা যাচ্ছে...আকাশি নীল রঙের শার্ট, সাদা প্যান্ট, হাতে ব্রিফ কেস! লম্বা শরীর সোজা করে রাজপুত্রের মতো হাঁটছে...হাঁটছে...রেশম চুল কাঁপছে বাতাসে। গলা শুকিয়ে গেল। শরীরের সমস্ত গ্রন্থিগুলো বুঝি এখ্খুনি টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে যাবে। নীলাঞ্জন এখানে এল কী করে? এই কলকাতায়? আরও কাছে আসতে নিজের ভেতর থেকেই যেন ছিটকে গেলাম। ভুল, ভুল, ভুল! মানুষটা নীলাঞ্জন নয়, নীলাঞ্জনের মতো। কী বোকা আমি। নীলাঞ্জন এখানে আসবে কেন? যদি বা আসেও এই প্রকাণ্ড শহরে কী করে দুজনের দেখা হবে? হয় না। স্বপ্নের পুরুষ কখনও বাস্তবে নেমে আসে না। সে আসে নীল অন্ধকারে, পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে, বাদামি ঘোড়ায় চেপে।

লোকটা আমাকে পেরিয়ে চলে যেতেই চারদিক যেন একেবারে শূন্য হয়ে গেল। কোথ্থাও যাব না আমি, কাউকে ডাকব না। অনেকক্ষণ একা থাকব এখন। একদম একা।

মেট্রো রেলের সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম। হোস্টেলেই ফিরছি। দুপুরবেলা শান্তিনীড় ফাঁকা থাকে। সবাই বেরিয়ে গেছে যে যার কাজে। নিরিবিলিতে চুপচাপ শুয়ে থাকব। সমস্ত পারিপার্শ্বিক ভুলে একটু যদি ঘুমিয়ে পড়ি, আরেকবার কি সে আসবে না? আমার স্বপ্নে?

বারো

আমরা পৌঁছনোর আগেই মণীশের মৃতদেহ এসে গেছে শ্মশানে। আবীর ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছে, আলতো করে কাঁকনের হাত ছুঁলাম,—'আয়।' কাঁকন নিস্পন্দ। কাঁকনকে দেখেই বোধ হয় এক ভদ্রলোক এগিয়ে এল। মুখে চাপ দাড়ি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। আমাকে আর আবীরকে একঝলক দেখে নিয়ে মাথা নাড়ল,—'আমি অরূপ, মণীশের বন্ধু।'

আবার ধকধক করছে বুকটা। কাঁকনকে ডাকতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল।,—'নামবি না?'

বার কয়েক ডাকার পর চোখ খুলল কাঁকন। ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিক দেখছে। আবীরের দিকে তাকালাম। ভীষণ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাচ্ছে। মনে হয় সেও যেন এই মুহূর্তগুলোর মধ্যে নেই। সমস্ত কঠিন দায়িত্ব এখন শুধু আমারই। কাঁকনের হাত ধরলাম—'কাঁকন প্লিজ।'

আমার কাঁধে ভর দিয়ে কাঁকন নয়, একটা নির্জীব পুতুল নামছে ধীরে ধীরে। অরূপ ডাকল,—'এসো কঙ্কনা। আমি জানতাম তুমি আসবে।'

কাঁকন শরীরটাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিল। নিশ্বাস ভারী। মণীশের মৃত্যু সংবাদ ওকে কি চিরকালের মতো বোবা করে দেবে? খবরটা শোনার পর থেকে এখনও একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

পুরনো লোহার গেট পেরিয়ে বাঁধানো রাস্তা ধরে ভেতরে ঢুকছি আমরা। আমি আর কাঁকন আগে, পেছনে আবীর, অরূপ। এই প্রথম আমার কোনও শ্মশানে আসা। যত এগোচ্ছি মৃত্যুর পোড়া গন্ধ ঝাপটা মারছে নাকে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। বেরোনোর আগে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শেষ শ্রাবণের আকাশ তবু ঘন কালো, বাতাস টালমাটাল। একদল লোক দাহ শেষ করে ফিরছে। কৌতূহলী চোখগুলো বার দুয়েক ঘুরে দেখল আমাদের। রাস্তার দুপাশে অসংখ্য ভেজা কাঠের স্তূপ। দুটো লুঙ্গি পরা লোক বিশাল দাঁড়িপাল্লায় কাঠ ওজন করছে। কত কাঠ লাগে একটা মানুষকে পোড়াতে? লোকদুটোও আমাদের আড়চোখে দেখছে। নিশ্চয়ই এখানকার ডোম। পেশিবহুল শরীর, চওড়া কাঁধ, চোখ তেলাকুচোর মতো লাল।

কাঁকনের কাঁধ থেকে আঁচল খসে গেছে। আলগোছে উঠিয়ে দিলাম। এলোমেলো চোখে তাকাল কাঁকন। অরূপ আবীরকে বলল,—'আমরা ইলেকট্রিকেই দিতে চেয়েছিলাম...এই বর্ষায়...দিদি খুব জোর করল...শেষের দিকে কিছুদিন নাকি মণীশ শুধু মৃত্যু আর চিতা নিয়ে কবিতা লিখেছে। কাঠের বিছানায় নিজেকে সাজিয়ে...'

কাঁকনের শরীর ঝাঁকিয়ে বিকট শব্দ ছিটকে এল। এখুনি বুঝি পড়ে যাবে। পেছন থেকে আবীরের ভাঙা ভাঙা গলা শোনা গেল,—'ও সব কথা এখন থাক না অরূপবাবু।'

অরূপও সচকিত হয়েছে, —'সরি।'

এই ভদ্রলোকই কি আজ ফোন করেছিল হোস্টেলে?

সকালে শাড়ি পরছি অফিস যাব বলে, কাঁকন দোতলার বাথরুমে, নীচ থেকে ছোড়দি ডাকল,—'কাঁকন তোমার টেলিফোন।'

স্নান করতে করতেই চিৎকার করল কাঁকন, —'রাই, আবীর ফোন করছে, একটু ধর না গিয়ে। বলবি আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ছি।'

বালুরঘাট থেকে ফিরে নতুন সংসারের শেষ কেনাকাটাগুলো সারতে আবীর আর কাঁকন দারুণ ব্যস্ত। কাপড়টা তাড়াতাড়ি জড়িয়ে নীচে এলাম। উকিলবাবু তখন অফিসঘরে বসে। আজকাল প্রায়ই সকালের দিকে আসেন। উকিলবাবুর সামনের চেয়ারে হাউসকোট পরা বড়দি। টেবিলের মাঝখানে রাখা রিসিভার কানে তুললাম।

—'কঙ্কনাকে একটু ডেকে দেবেন?'

আবীরের গলা তো এত ভরাট নয়।

—'কাঁকন একটু ব্যস্ত আছে। আমি ওর বন্ধু। কিছু দরকার থাকলে আমাকে বলতে পারেন।'

ও প্রান্ত ক্ষণকাল নীরব।

—'আপনার নম্বরটা বলুন, ওকে পরে রিঙ করতে বলছি।'

—'থাক দরকার নেই,...' গম্ভীর স্বর আবার থমকাল।

—'কঙ্কনাকে জানিয়ে দেবেন মণীশ পরশু রাতে সুইসাইড করেছে।'

খবরটা এতই অপ্রত্যাশিত যে প্রথমটা বুঝতেই পারিনি,

—'কে মণীশ?'

—'কবি মণীশ সান্যাল। ওকে বলবেন, তা হলেই বুঝবে।'

লোকটা ফোন রেখে দিচ্ছে, রিসিভার খামচে ধরলাম, 'এক সেকেন্ড, কীভাবে মারা গেল মণীশ?'

—'বললাম তো সুইসাইড করেছে,' লোকটার গলায় বিরক্তি,—'আজ দুপুরে বডি পাওয়া যাবে। আশা করছি তিনটের মধ্যে শ্মশানে নিয়ে যেতে পারব। ও যদি দেখতে চায়...'

লোকটা কী নির্দয় ভাবে বলে যাচ্ছিল কথাগুলো। একবার মনে হল কেউ বদমাইশি করে ফোন করছে না তো? কিন্তু এরকম সংবাদ...! চোখ বুজে ফেললাম। আমাকেই কেন এ খবর শুনতে হল?

উকিলবাবু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। বড়দি চোখ থেকে চশমা খুলল,

—'তোমার মুখ এমন সাদা হয়ে গেছে কেন রাই? কে মারা গেছে?'

রিসিভার নামিয়ে সজোরে ঠোঁট কামড়ে ধরেছি।

—'কাঁকনের ফোন ছিল না?'

মাথা নাড়লাম।

—'কে করেছিল? আবীরবাবু?'

আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বেশি না বললেও, এখানকার সবার নাড়িনক্ষত্র বড়দির মুখস্থ।

—'কাঁকনের আগের হাজব্যান্ড মারা গেছে।'

—'কখন?'

—'পরশু।' কথা বলতে বলতেই পরের কর্তব্যগুলো চটপট স্থির করে ফেলছি।—'আমি কি এখান থেকে গোটা দুয়েক কল করতে পারি?'

উকিলবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, —'তুমি কাঁপছ, এখানে বসো।'

ফোনের অনুমতি পাওয়ার পর অন্য চিন্তা মাথায় ঢুকেছে। আবীর কিংবা কাঁকনের শ্যামবাজারের মামা কারুর নম্বরই জানা নেই। কাঁকন বাথরুম থেকে না বেরিয়ে থাকলে ওর ডায়েরি খুঁজে দেখা যায়। বেরোব বলে পেছন ফিরেছি, সামনেই কাঁকন। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

মোট তিনটে চিতা জ্বলছে ভেতরে। চাতালে টুকরো টুকরো মানুষের ভিড়। ডানদিকের উঁচু বেদির একধারে ফুলশয্যায় শুয়ে মণীশ। মণীশকে ঘিরে ছোটখাটো জটলা। অরূপ কাঁকনকে নিয়ে গেল সেদিকে। আমার পাশে দাঁড়ানো আবীর নিশ্চল। খবর দেওয়ার দরকার হয়নি, কাঁকনকে ডাকতে ও নিজেই এসেছিল হোস্টেলে।

মণীশের এক আত্মীয়া ডুকরে উঠল। পাশেই কোনও কারখানায় সাইরেন বাজাচ্ছে। কান্না আর সাইরেনের শব্দ এক হয়ে গেল। গামছা কাঁধে কয়েকটা অল্পবয়স্ক ছেলে বাঁদিকের ধাপে বসে। একজন সামনের চিতায় জ্বলন্ত সিগারেট ছুড়ে দিল। পাঁচিলের দিকের চিতাটা নিভু নিভু। ঘাট থেকে কলসি করে জল এনে ঢালছে শ্মশান বন্ধুরা। একটু পরে মণীশ সান্যালও ওই ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জীবনের মানে তবে এই? কদিনের জন্য আসা, তারপর ছাই হয়ে মিশে যাওয়া মাটিতে! শরীর মন অসাড় হয়ে আসছে আমার। গলার কাছে অকারণ কান্নার ডেলা। হাত বাড়িয়ে আবীরের শার্টের হাতা খামচে ধরলাম,—'আমি বাইরে যাব।'

আবীরের থমথমে মুখ আমার দিকে ফিরল। মণীশের অতর্কিত মৃত্যু তাকেও যেন নির্বাক করে দিয়েছে।

অরূপ ছুটে এল,—'আপনারা কঙ্কনাকে নিয়ে আসুন।'

আবীর আমার পিঠে হাত রাখল। আমি নয়, আমার হয়ে অন্য কেউ হাঁটছে যেন। কখন কাঁকনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি জানি না। মাথার ওপর চাপা শব্দে মেঘ গুড়গুড় করে উঠল। ভেজা কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে। মৃত মানুষেরা শুধুই কালচে ধোঁয়া হয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে, আরও ওপরে। আদি গঙ্গার দিক থেকে আসা কনকনে বাতাস দখল নিতে চাইছে গোটা চত্বরটার। লকলকে শিখা মাতালের মতো দুলছে।

কাঁকন আচমকা ফিসফিস করে উঠল কানের কাছে, —'আমাকে মিথ্যে বলে এনেছে রে। এটা মণীশই নয়।'

ভয়ংকর ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠলাম যেন। কী বলছে কাঁকন? মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

—'কী বলছিস তুই?' চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম। কয়েক হাত তফাতে মণীশের চিতা সাজানো প্রায় শেষ। ঘাটপুরুত কী নির্দেশ দিল। কাঁকন নির্বিকার। মৃতদেহের চারপাশে অবিরাম ঘুরতে শুরু করেছে। তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করছে মণীশের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

—'দূর, এ মণীশ হতেই পারে না।...শরীরটা মণীশের...কিন্তু নাহ্, এটা মণীশ নয়।'

এবার এক বয়স্ক ভদ্রলোক হনহন করে খাটের সামনে এগিয়ে এলেন—'অনেক ড্রামা হয়েছে। এটা পাবলিক স্টেজ নয়। সরাও একে এখান থেকে। যত্ত সব...'

আত্মীয়া মহিলাটির কান্নাও সঙ্গে সঙ্গে রাগে আছড়ে পড়েছে,—'কে এখানে আসতে বলেছে ওই সর্বনাশীকে? কেন এসেছে ন্যাকামি করতে?'

—'আঃ দীপুদি, চুপ করুন।' একজন মহিলাকে সরিয়ে নিতে চাইল।

—'না, আমি যাব না।...ওই...ওই...ওই মেরেছে আমার ভাইকে। ওর জন্যই মণীশ...তোরা কেন খবর দিয়েছিস ওকে?'

হঠাৎ শুরু হওয়া নাটক দেখতে অনেকে জড়ো হয়েছে বেদির কাছে। হকচকিয়ে পিছিয়ে এলাম। কাঁকন শুনেও শুনছে না। ঘনঘন মাথা নেড়েই চলেছে। হ্যাঁচকা টানে আবীর ওকে বেদি থেকে নামিয়ে নিল। মহিলা চিৎকার করে অভিশাপ দিয়েই যাচ্ছে। রাগ, ঘৃণা আর ক্ষোভ মেশানো কান্না ক্রমশ আরও বিকৃত। সত্যিই তো, কাঁকনকে কেন খবর দেওয়া হয়েছিল? কী দরকার ছিল ওকে জানানোর? কাঁকনই বা কেন এসেছে এখানে? যার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে গেছে...? আমরাই বা কেন ওকে আসতে দিলাম? আবীর না হয় কিছু বলতে পারেনি, আমি কেন বাধা দিইনি? তবে কি আমিও মনে মনে সেই পুরনো সংস্কারের গণ্ডিতেই আটকে আছি? এখনও পিছিয়ে যেতে ভালবাসি? এ কি অযৌক্তিক আবেগ।

বিকট উল্লাসে হরিধ্বনি দিতে দিতে আরেকটা দল শ্মশানে ঢুকছে। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভয়ানক ভূমিকম্পে সব ছারখার হয়ে যাওয়ার মতো নিজের ভিতরই নিজে ভাঙছি...ভাঙছি...ভাঙছি...। আবীরকে ছাড়িয়ে কাঁকন আবার জোর করে ভেতরে যেতে চাইছে। পলকে আমি যেন কাঁকন হয়ে গেলাম, কাঁকন আমি। দুহাতে মেয়েটার কাঁধ খামচে ধরেছি,—'কী হচ্ছে কী? আর একদম পাগলামি করবি না। মাথা ঠাণ্ডা কর।'

আবীর হতাশভাবে মাথা নাড়ল—'কাকে বলছেন? ও কি আর নিজের মধ্যে আছে?'

গোটা তিনেক বাচ্চা ছেলে হাঁ করে আমাদের দেখছে। বিনা পয়সায় মজা দেখতে পথচারীও দাঁড়িয়ে গেছে দু-একজন। অচেতন রাইকিশোরীকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখনও নিশ্চয়ই অনেকে এরকম ভিড় করে...। আবীরকে ধমকে উঠলাম,—'এখানে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?'

বিহ্বল আবীর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওরও কি মাথা কাজ করছে না? এবার ধাক্কা দিলাম,—'এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, প্লিজ। আমি কাঁকনকে সামলাচ্ছি। আপনি যান, ওই মোড়ে গিয়ে দেখুন একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় কি না...'

অনেক কষ্টে ঘুম পাড়ানো গেছে কাঁকনকে। ডাক্তার ঘুমের ইন্‌জেকশন দেওয়ার পর আস্তে আস্তে

শান্ত হল। নিজেরই হাতে সাজানো ঘরে, নরম বিছানায় হাঁটু মুড়ে কেমন কাঙালভঙ্গিতে শুয়ে আছে মেয়েটা। আবার নিজেকে ফিরে পাবে তো? শ্মশানে বারবার ওকথা কেন বলছিল। ...ওটা মণীশ নয়...মণীশের শরীর। এ কেমন ভ্রান্তি! নাকি অপরাধবোধ এসেছে মনে। আবীরকে বিয়ে করার সঙ্গে মণীশের মৃত্যুটাকে গুলিয়ে ফেলেছে। মণীশই বা আত্মহত্যা করল কেন? ঠিক কাঁকনের বিয়ের চারদিন আগে? এ কি শুধুই নৈরাশ্য, না তার সঙ্গে মিশে ছিল ঈর্ষা আর প্রতিশোধের বাসনা? কিংবা শুধুই প্রকৃতির ওপর তীব্র অভিমান? হয়তো সবই! ঘুমের ঘোরে কাঁকন কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। ভয়? নাকি লড়াই করছে নিজের সঙ্গে? ভাল করে গায়ে চাদরটা টেনে দিলাম। আমি কিছুতেই এভাবে কাঁকনকে নিঃশেষ হতে দেব না।

দরজার কাছে উঠে গেলাম। ব্যালকনিতে আবীর মূর্তির মতো স্থির। দিন ফুরোবার আগেই আজ অন্ধকার নেমে এসেছে। যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে। আকাশ ফ্যাকাশে লাল।

আবীরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম,—'চা খাবেন একটু? করে দেব?'

আবীর মুখ ফেরাল,—'আপনি বসুন, আমি চা করে আনছি।'

বাধা দিলাম না। একটু নড়াচড়া করুক।

রান্নাঘরে কাপে চামচ নাড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নিঝুম ফ্ল্যাটে এরকম মৃদু ঠুং ঠাং শব্দ বড় কানে লাগে। দু কাপ চা হাতে নিয়ে চেয়ারে এসে বসল আবীর। নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে, 'আমাদের কি বালুরঘাটে একটা খবর দেওয়া উচিত?'

—'ওর মামাকে কাল জানাতে পারেন। শ্যামবাজারে।' আবীর সামান্য নার্ভাস হল,—'ওঁরা কি কাঁকনকে নিয়ে চলে যাবেন?'

এ কথার আমি কী উত্তর দেব? কোথায় থাকলে ভাল থাকবে কাঁকন? নিজের বাড়িতে, আবীরের ফ্ল্যাটে, নাকি একদম একা?

আবীর চায়ে চুমুক দিল। সামনের রাস্তা থেকে একটা একলা ল্যাম্পপোস্টের আলো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ব্যালকনির দিকে।

সেদিকে ফিরে জোরে জোরে মাথা নাড়ল,—'সব কেমন আপসেট হয়ে গেল। মানুষ ভাবে এক আর হয়...'

—'এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? এটা একটা টেম্পোরারি ফেজ। শরীর সুস্থ হলেই...'

—'আপনার তাই মনে হয়?'

—'নিশ্চয়ই।' পিঠ সোজা করে বসলাম।

আবীর সিগারেট ধরাল, —'আপনিই বলুন তো, আমার কি কাঁকনকে বুঝতে ভুল হয়েছিল?'

—'এ কথা কেন বলছেন? আপনি জানেন না গত কমাস ধরে ও শুধু আপনার কথাই...'

—'আমিও তো তাই ভাবতাম। কিন্তু ওর মনে যে একটা উলটো স্রোতও বইছে, বুঝতেই পারিনি। সবসময় মনে হয়েছে যে জীবনটা ফেলে এসেছে তার প্রতি আর কোনও পিছুটান নেই। অথচ দেখুন মন থেকে এখনও আগের ঘরটাকেই পুরোপুরি ভেঙে ফেলতে পারেনি। এভাবে কি নতুন কিছু শুরু করা যায়? করলেও টেঁকে?'

এক নিশ্বাসে কথা বলে যাচ্ছে আবীর। বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল। কাঁকনকে আবার পুরনো অন্ধকারে ফেলে আবীর কি চলে যাবে? ছটফট করে উঠলাম,—'আপনি তো কাঁকনকে ভালবাসেন আবীরবাবু।'

—'বাসি। নিশ্চয়ই বাসি।'

—'তা হলে শুরু না করার কথা ভাবছেন কেন? আজকের ঘটনায় কাঁকনই তো কষ্ট পেয়েছে সবথেকে বেশি।'

আবীর চুপ।

মনে মনে কথা গুছিয়ে নিলাম,—'দেখুন, ঘর তো বাঁধি আমরাই, মেয়েরাই। আপনারা সেখানে বাস করেন মাত্র। সেই ঘর একবার যদি ভেঙে যায়, তার যন্ত্রণা যে কী অপরিসীম কিংবা তারও পরে প্রতিটি স্টেপে কী যে হতাশা আর গ্লানি সহ্য করতে হয় মেয়েদের, তা আপনারা বুঝবেন না।'

—'তার সঙ্গে আজকের কী সম্পর্ক?'

আবীরের মুখ অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ও কি খুবই অপমানিত বোধ করছে? না নিছক অভিমান কাঁকনের ওপর?

—'আজকের কথাটা ভুলে যান। আমি কাঁকনকে জানি। ও খুব শক্ত মেয়ে। ঠিক সামলে উঠবে, দেখবেন। এই কাজে এখন একমাত্র আপনিই পারেন ওকে সাহায্য করতে।'

—'সাহায্য তো আমি করতেই চাই। তাই তো ওকে...কিন্তু আবার যতটা পিছনে চলে গেল...আমি কি পারব সমস্ত বাধা কাটিয়ে নতুন করে?'

মোড়া থেকে উঠে ব্যালকনির ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। নিজের মধ্যে কী হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। একটা দুর্ঘটনায় নিজেকে হারাতে বসেছিলাম, আরেকটা দুর্ঘটনা কি আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছে। তবে কি এভাবেই পরিবর্তন আসে! নাকি এ পরিবর্তন এসেছে অনেকদিন ধরে, একটু একটু করে আমার প্রতিটি প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে। যেমনভাবে ভেতরে অবিরাম চুঁইয়ে পড়া জল আলগা করে দেয় পাহাড়কে, ধস নামে হঠাৎ ঝড়ে। সামনের রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে একটা ট্রাক ছুটে গেল। আবীরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম,—'আমার দাদা প্রায় একটা গল্প বলে জানেন...সিসিফাস নামে এক গ্রিক যুবকের গল্প। সে সকাল থেকে রাত অবধি একটা প্রচণ্ড ভারী পাথরকে ঠেলে ঠেলে তুলত পাহাড়ের ওপরদিকে। কিন্তু কিছুদূর ওঠার পর পাথর গড়িয়ে যেত নীচে। আবার যুবক নতুন করে শুরু করত ঠেলা। খুব কষ্ট হত তার। রোজ একই কাজ, একই কষ্ট। মাঝে মাঝে হতাশায় ভেঙে পড়ত। ভারী পাথরটাকে বুঝি কোনওদিন তোলা যাবে না পাহাড়ের মাথায়। ভাবত আর যন্ত্রণা পেত। তারপর একদিন নিজেই বুঝতে পারল ওই পাথর ঠেলাটাই তার নিয়তি। পাথর কোনওদিনই চূড়ায় পৌঁছবে না তবু এই কাজই তাকে করে যেতে হবে। অনন্তকাল। সে তখন ঠিক করল, না, ভেঙে পড়বে না, পাথর যতবার খুশি নেমে যাক, আবার সে সেটাকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করবে। অবাক কাণ্ড, এরকম একটা অনুভূতি আসার সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেল, কাজটা করতে আর তার মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। বরং এক ধরনের আনন্দ আছে এই সংগ্রামে।...আমার মনে হয়, আপনার, আমার, কাঁকনের সবার জীবনই সিসিফাসের জীবন। নিজেকে ঠেলে ঠেলে তোলা, আবার গড়িয়ে নেমে আসা, আবার তোলা, আবার নামা, এ ভাবেই...'

আবীর আরেকটা সিগারেট ধরাল। বুঝতে পারছে আমি কী বলতে চাইছি?...এ গল্প আমি বললাম কাকে? আবীরকে? না নিজেকে?

চাপা গোঙানির শব্দ আসছে ঘর থেকে। কাঁকনের ঘুম ভেঙে গেল নাকি? আমি যাওয়ার আগেই আবীর ঝড়ের মতো ছুটে গেছে। গভীর উৎকণ্ঠায় ঝুঁকেছে কাঁকনের মুখের কাছে, —'কী কষ্ট হচ্ছে কাঁকন? জল খাবে?'

কাঁকনের বোবা চোখ খুলেই বুজে গেল। আবার ঘুমিয়ে পড়ল বোধ হয়। কী সুন্দর করে কাঁকনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আবীর। ঘুমের ওষুধের ক্রিয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কাঁকনের কপালে আবীরের হাত নরম উত্তাপ পাঠিয়ে দিচ্ছে যেন। এরই নাম তবে ভালবাসা। এরই জন্য একজন পুরুষের একটি নারীকে বা একজন নারীর একটি পুরুষকে প্রয়োজন হয়। চোখ ঝাপসা হয়ে এল। আবীরের সঙ্গে কার মিল...খুব মিল? কে সে? বাইরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সরে এলাম দরজা থেকে। ঝড় বৃষ্টি আসার আগেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

তেরো

কাকলির জন্য থেমে থাকেনি কিছু, কাঁকনের জন্যও থামল না। হোস্টেল চলছে নিজের মনে। সেই গান, হইহই, চিৎকার ঝগড়াঝাঁটি। তার মধ্যেই যে যার কাজে বেরিয়ে যাওয়া, ফিরে আসা। তার মধ্যেই ব্রততীরা আনন্দ খুঁজছে নিজস্ব কায়দায়, শুভ্রারা আরও হিংস্র হয়ে উঠছে! আর শুধু বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে আছে মন্দিরাদি, বন্দনাদি, হিরণদিরা। জীবনযাপন নয়, যেন কোনওরকমে জীবন ধারণ। বড়দি ছোড়দিই বা কোন ব্যতিক্রম। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝড় তোলে এক-আধজন, তারপর আবার জীবন বৃত্তের

মতো।

কাকলি ফিরল না। হাসপাতাল থেকে ওর জ্যাঠামশাই নিয়ে গেছে ওকে। কোথায়, কীভাবে যে এখন আছে। মেয়েটা এত বোকা। পায়ের তলায় মাটি পাওয়ার সুযোগ পেয়েও স্বেচ্ছায় ছেড়ে তলিয়ে যাচ্ছিল। আর কি সুযোগ পাবে? নাকি শুভ্রার মতোই ক্রমশ জেদি, বেপরোয়া হয়ে যাবে? জানি না। আমার ভাবতে ভয় করে।

অর্জুন ট্রাভেলস পনেরো দিনের মধ্যে জয়েন করতে বলছে আমাকে। চিঠিটা তাকের ওপর পড়েই আছে। শেষে ওই চাকরিটাই পেলাম। আপনারা তো জানেনই ওই অফিসের লোকজন, পরিবেশ, কেতাকায়দা কিছুই আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে কী কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মালহোত্রা ব্রাদার্স এক মাসের নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে। অফিসের সকলকেই। ভিনোদ হয়তো অন্য এজেন্সি খুলবে। অশোক মালহোত্রা বিয়ে করছে মার্গারেটকে। মালহোত্রা ব্রাদার্স আবার চালু হলে, যার সম্ভাবনা খুবই কম, মার্গারেট হবে নতুন মালকিন। নোটিশ দেওয়ার আগে দুই ভাই একসঙ্গে অফিসের সকলকে ডেকেছিল ঘরে। কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, ভাই ভাই ভিন্ন হতে চলেছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পৈতৃক প্রতিষ্ঠান, তবু নিজেদের ভিতরকার বিবাদ আমাদের বুঝতে দিতে চায় না। যাদের অনেক টাকা থাকে তারা বোধ হয় এরকমই রঙিন মুখোশে আড়াল করে রাখতে পারে নিজেদের। আমরা, মধ্যবিত্তরা, আবেগ লুকোতে জানলাম কই! মিস্টার মেনন তো একঘর লোকের সামনে চশমা খুলে চোখ মুছতে লাগলেন। এই বয়সে নতুন চাকরির সন্ধান করা...! ব্যানার্জিদা অবশ্য ভাঙলেও মচকাননি। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, কমপেনসেশন, সব কিছুরই দাবি জানিয়েছেন জোর গলায়। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নাকি দীর্ঘদিন জমাই দেয়নি কোম্পানি। ব্যানার্জিদা বলেছেন কেস করবেন। কী জানি, শেষ পর্যন্ত হয়তো ফয়সালায় আসতেও পারে মালহোত্রারা। তবে সে সব তো মিস্টার মেনন বা ব্যানার্জিদাদের মতো পুরনো কর্মচারীদের বেলায়, আমাদের কী হবে? আমার, ক্রিশ্চিনের কিংবা অজয় সিনহার? অজয় সিনহার চোখ দুটো সেদিন মরা মাছের মতো নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। হাঁ করে মেয়েদের দেখার মানসিকতা আর নেই বেচারার। ডোমা, শার্লি নতুন অফিসে জয়েন করে গেছে। রোজ ভাবি ওদের ফোন করব, ডায়াল ঘোরাতে গেলেই অভিমান কামড়ে ধরে হাতটাকে। ওরাই বা একদিনও কেন খোঁজ নিল না আমাদের? নতুন জায়গায় গিয়ে ভুলে গেল? এটা আমার ভুল অভিমান। নতুন থেকে নতুন, আরও নতুনের দিকে এগিয়ে চলার নামই বেঁচে থাকা। থাক তবে, ওরা আমার স্মৃতিতেই থাক প্রথম বাইরের জগতের আলোর প্রতিনিধি হিসেবে।

ক্রিশ্চিন অনর্থক রাগ করে।

—'অল সেলফিশ। প্রতিটি মানুষই স্বার্থপর পৃথিবীতে।' ম্যাথুজের ওপর অভিমান ক্রিশ্চিনের এখনও যায়নি। তবে কিছুদিন হল আরেকটা বন্ধু পেয়েছে, জেমস ডোনাল্ড। অফিসের পর ছেলেটার সঙ্গে মোটর বাইকে করে পাখির মতো উড়ে যায়। রিচির সঙ্গেও ইদানীং খুব ভাব। রোজ টিফিনে আমাকে নিয়ে 'হোল ইন দা ওয়ালে' যেতে চায় মেয়েটা। কী করে বোঝাই প্রতিদিন ওখানে গিয়ে টিফিন করার বিলাসিতা আমার সাজে না। শেষ গিয়েছিলাম গত সপ্তাহে। জন তার স্বাভাবিক হাসিমাখা মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করল। ক্রিশ্চিন তখন রিচির সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। একগাল হাসলাম।

—'ফাইন জন, থ্যাঙ্ক ইউ।' ...ফাইন...ফাইন...শব্দটা কী সুন্দর অথচ নির্মম, তাই না? কত মানুষকে যে ভাল না থেকেও দিনরাত ভাল আছি, ভাল আছি বলে যেতে হয়। মালহোত্রা ব্রাদার্স ছেড়ে কোথায় যাব জানি না, তবে জনের দোকানটা মনে থাকবে চিরদিন। ওটাও তো আমার পৃথিবী দেখার আরেকটা জানলা কিনা। টিফিন থেকে ফিরলে অজয় সিনহা আজকাল আর ছাগলছানার মতো লাফিয়ে কাছে আসে না। কেমন বিমর্ষ সবসময়। মাঝে মাঝে অদ্ভুত আক্ষেপ করে।

—'আপনাদের আর কী। মেয়েদের ঠিক কোনও না কোনও চাকরি জুটে যায়। কিছুদিন বেকার বসে থাকলেও যায় আসে না। আমাদেরই যত...।'

বেশির ভাগ ছেলেরই মেয়েদের চাকরি করা সম্বন্ধে ধারণা এই রকমই। রাগ করি না। সত্যিই তো, এই বেকারির বাজারে সিন্‌হার মতো ছেলেদের আরেকটা চাকরি জোগাড় করা...। এদের মনের জোর বড় কম। এরকম ভিতু ভিতু, লোভী লোভী মানুষেরা দুনিয়াতে থাকবেই। এরাই বুঝি সবথেকে বেশি

হতভাগ্য।

তবে জানেন, শ্রীকান্ত মজুমদারকে আমি ছাড়িনি। গতকাল সন্ধেবেলা হোস্টেলে ফিরছি, হঠাৎ বাসস্ট্যান্ডে দেখা, সঙ্গে বউ মানে চন্দনার ননদ আর দুটো গাবলু গাবলু বাচ্চা। আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, নিজেই এগিয়ে গেলাম,

—'কী মশাই, চিনতেই পারছেন না দেখছি।'

শ্রীকান্তবাবু থতমত।

—'না মানে চিনব না কেন? কেমন আছেন? ভাল?'

সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে আমি তখন মরিয়া। লোকটাকে এতদিনে কবজায় পাওয়া গেছে।

—'বা রে, পরশু দিনও দেখা করলেন আমার সঙ্গে। একদিনেই খারাপ থাকব?'

পাশে দাঁড়ানো চন্দনার ননদ গোল গোল চোখে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। লোকটা এত অভদ্র যে বউ-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার মতোও সৌজন্যবোধ নেই। ভদ্রমহিলাকে একটা হাসি উপহার দিলাম,—'বুঝলেন ভাই, আপনার কর্তার নামে আমার প্রচুর নালিশ আছে। আমাদের এতদিনের পরিচয়, রোজ কত গল্প করে, এত কাছেও থাকি, তাও একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করল না...'

—'কোথায় থাকেন?' আমার দিকে নয়, স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ভদ্রমহিলা।

—'এই তো, আপনাদের মাত্র কয়েকটা বাড়ি পরে, শান্তিনীড়ে। আমার কথা হয়তো শুনে থাকবেন, আমি আপনার ভাই-এর বউ চন্দনার ছোটবেলাকার বন্ধু...শ্রীকান্তবাবু তো সেই সূত্রেই...'

পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না শ্রীকান্তবাবু। উড়তে উড়তে হোস্টেলে চলে এলাম। কী হালকা যে লাগছিল নিজেকে। মনে হচ্ছিল নির্ভার জলকন্যার মতো বাতাসের সমুদ্রে ভাসছি। শ্রীকান্তবাবু নির্ঘাত বউকে ঠাণ্ডা করতে অনেক আজেবাজে নোংরা কথা বলবে আমার নামে। বলুক গে যাক, হোস্টেলে ফিরে আমি তো প্রাণ খুলে হেসে নিতে পেরেছি। একা একা আমার হাসি দেখে বন্দনাদি অবাক, —'কীরে রাই, পাগল হয়ে গেলি নাকি?'

—'নাগো না, একটা গিরগিটি রং পালটাবার চেষ্টা করছিল, দিয়েছি তার লেজ মাড়িয়ে...হি হি...হিহি...'

বন্দনাদির ভুরু কুঁচকে গেল,—'কী আবোল তাবোল বকছিস?'

কী করে বোঝাই, নিজেকে অতিক্রম করায় যে কী মুক্তি। বন্দনাদিরা তো ছোট্ট এক ফালি হোস্টেলের সিটকে আঁকড়েই কাটিয়ে দিচ্ছে এবারকার জীবনটা। হয়তো কোনও কোনওদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বুকটা মুচড়ে ওঠে, মনে হয় কী যেন নেই, মনে হয় কী যেন পাওয়ার ছিল, তারপর সকালে উঠেই নতুন ক্ষুদ্রতম কারণে ঝগড়া শুরু করে কারুর সঙ্গে। আজও সকালে যেমন হিরণদির সঙ্গে করছিল। সামান্য ব্লাউজ শুকোতে দেওয়া, তার জন্যও তারের ওপর কেউ কাউকে এক সেন্টিমিটার জায়গা ছাড়তে রাজি নয়। মঞ্জুদির ঘণ্টা নাড়ার শব্দ প্রবল তখন। মন্দিরাদি নিরাসক্ত মুখে নিজের জামাকাপড় ইস্ত্রি করতে ব্যস্ত। দাদাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম। নিজের সব অনুভূতির কথা জানিয়ে বিরাট লম্বা চিঠি। ওদের চিৎকারে কলম বন্ধ করতে হল। কাঁকন থাকলে ঠিক ধমকে থামিয়ে দিত দুজনকে।

কাঁকনকে মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে ওকে দেখতে যাই। কেমন যেন সাদা চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। চিনতেই পারে না। আমার বুক কেঁপে ওঠে, গলার কাছে বাষ্প দানা বাঁধতে থাকে। ডাক্তার অবশ্য বলেছে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু আবীর কি ততদিন বসে থাকবে ওর জন্য? কেউ কি সত্যি সত্যি অপেক্ষা করে থাকে? থাকে, থাকে।

...কাঁকনের ঘটনার পরদিনই ফোন করেছিলাম সিদ্ধার্থকে। ঠিক নিজে যে করেছিলাম তাও নয়, কে যেন আমার আঙুলগুলোকে চালিয়ে ডায়াল করিয়ে নিল। ও প্রান্তে সিদ্ধার্থ আসতেই জিভ শুকিয়ে গেছে।

—'কে বলছেন?'

সিদ্ধার্থ বার কয়েক হ্যালো হ্যালো করার পর স্বর ফুটল,—'আমি রাই।'

সিদ্ধার্থ সামান্য থমকাল যেন। নাকি আমারই মনের ভুল? আবার বললাম,—'আমি রাই,

রাইকিশোরী।'

—'বলো।'

—'কেমন আছেন আপনি?'

—'ভাল। ভালই।'

—'রাগ করে আছেন এখনও?'

—'নাহ্।'

—'আমার ফোন পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?

—'আমি সহজে অবাক হই না রাই।'

—'একটুও অবাক হননি?'

—'একটুও না।'

—'আমার কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।'

—'বলে ফ্যালো।'

—'ফোনে নয়। বিকেলে একবার আমার অফিসের সামনে আসবেন?'

টেলিফোনটা রেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। একটু একটু ভাল লাগছিল যেন। সাড়ে পাঁচটায় নীচে নামতে, বহুকাল পর ফুটপাথে সিদ্ধার্থ। নিজেকে তৈরি করে এগিয়ে গেলাম,—'চলুন, একটা জায়গায় যেতে হবে।'

—'চলো।'

সিদ্ধার্থ রীতিমতো গম্ভীর। আগের সেই হাসিখুশি ভাবটাই নেই। আমিই দায়ী এর জন্য। হাসার চেষ্টা করলাম,—'জানতে চাইলেন না কোথায় যাব?'

সিদ্ধার্থ এতক্ষণে সোজাসুজি তাকাল। আমার চোখে কী যেন খুঁজতে চায়, —'জানার দরকার নেই।'

—'আপনি বিরক্ত হচ্ছেন?'

—'না আ।'

—'বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি অপমান করতে চাইনি।' চোখ বুজে ঝড়ের মতো বলে গেলাম,—'তারপর থেকে আমার এত খারাপ লেগেছে...আসলে সেদিন একটা লোক এমন বিশ্রীভাবে রাস্তায় আমাকে...'

—'থাক রাই, আমি শুনতে চাই না।' সিদ্ধার্থ মুখ ফিরিয়ে নিল—'ট্যাক্সি ধরবে একটা?'

রেড রোড ধরে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি। পথের দুপাশে সবুজের পর সবুজ। তারও ওপাশে উঁচু উঁচু বাড়িগুলো। উজ্জ্বল সবুজের মধ্যে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে বিকেলটা। সিদ্ধার্থকে কেন নিয়ে যাচ্ছি আবীরের ফ্ল্যাটে? কাঁকনের কথা বলতেই কি ওকে ডেকেছি? কাল থেকে প্রাণ খুলে কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। সিদ্ধার্থকেই খুঁজছিলাম আমি? নাকি কাঁকনকে একা দেখতে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না তাই...? বুঝতে পারছি না। ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। উলটোদিকের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সিদ্ধার্থ। বুঝি ঠিক করেই এসেছে নিজে যেচে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলবে না। ও কি অনেক বদলে গেছে? আমার কথাগুলোও মন দিয়ে শুনতে চাইছে না? কেন এত নিরাসক্তি? একজনও কি আমাকে বোঝার চেষ্টা করবে না? চোখদুটোকে সামলে রাখতে পারছি না! আঁচলে মুখ ঢাকলাম।

সিদ্ধার্থ চমকে তাকিয়েছে,—'কাঁদছ কেন রাই?'

প্রাণপণে কান্নাটাকে গিলে ফেলতে চাইলাম।

—'প্লিজ রাই।' সিদ্ধার্থ আমার কাঁধে হাত রেখেই সরিয়ে নিল।

ঘষে ঘষে চোখ মুছে নিলাম,—'আমি খুব...খুব...খুব খারাপ মেয়ে।'

নির্জন অন্ধকারে রাত্রিটা বড় সুন্দর। বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চিনচিন করে উঠল বুকটা। বিকেলে ম্যান অফ ওয়ার জেটির পাশে বসে সিদ্ধার্থ আজ জিজ্ঞাসা করেছিল,—'কী ঠিক করলে রাই?'

—'কী ব্যাপারে?'

—'তোমার চাকরির...'

—'জানি না।'

হাওয়ার দিকে পিছন করে সিদ্ধার্থ সিগারেট ধরাল, —'দিদি তোমাকে কালকেই দেখা করতে বলেছে। কোনও চাকরির খোঁজ আছে বোধ হয়।'

সামনের গেরুয়া জলে খেলনার মতো লঞ্চগুলো ছোটাছুটি করছে। মাঝগঙ্গা বেয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে একটা ছোট্ট পালতোলা নৌকো। সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

—'যদি চাও, আজই যেতে পারো আমাদের বাড়ি।'

দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারলাম না, —'কারুর সাহায্য ছাড়াই এবার কাজ জোগাড় করে নেব ভেবেছিলাম।'

—'সে তো তুমি করেছই। ইচ্ছে করলেই অর্জুন ট্রাভেলস-এ...'

—'ওটা নেব কি না ঠিক করিনি।' হাঁটুতে মুখ রাখলাম,—'ভাবছি কিছু না হলে কৃষ্ণনগরেই না হয়...

সিদ্ধার্থ আচমকা আমার হাত চেপে ধরল, —'না রাই, যেয়ো না, তোমাকে আর আমি হারাতে চাই না।'

প্রথম বর্ষার ফোঁটা পাওয়া বাঁশপাতার মতো কেঁপে উঠল গোটা শরীর। এই স্পর্শের জন্যই কি তবে এতদিন ধরে আমি অপেক্ষা করে ছিলাম? সেই আমার কৈশোর থেকে? এ কার স্পর্শ? অনিমেষ আমাকে ছুঁলেও তো কোনওদিন এত রোমাঞ্চিত হইনি। নিজের মনে বলে উঠলাম,—'আমি আর কোনওদিনই হারাব না।'

পেছনের ভাঙা প্রাসাদ থেকে বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। একটা চোরা স্রোত বয়ে যাচ্ছে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। গলার কাছে নাম না জানা কষ্ট! কে ছুঁয়েছিল আমাকে আজ? গালে গাল রেখেছিল? সিদ্ধার্থ? না নীলাঞ্জন? জংলি মাদল বেজে উঠল রক্তের ভেতর। অন্ধকার ছুঁয়ে প্রশ্ন করলাম,

—'কী চাও রাই?'

—'বুঝতে পারছি না।'

—'আমি বুঝতে পারছি।'

—'কী?'

—'মোটামুটি একটা ভাল চাকরি তো বটেই। নিজের পায়ে দাঁড়ানো, নিজেকে...'

—'তা ছাড়া?'

—'কী তা ছাড়া?'

—'জানো না তুমি? মন্দিরাদির দিকে তাকিয়ে দেখেছ ভাল করে?'

—'হ্যাঁ, বড় নিঃসঙ্গ...'

—'বন্দনাদি মঞ্জুদিকে দেখেছ? কেমন শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে গেছে। কাজের সময়টুকু ছাড়া সারাক্ষণ অন্যের নিন্দে করে বেড়ায়?'

—'না হলে কী নিয়েই বা বাঁচে তারা?'

—'আর হিরণদি? সুখী মুখ দেখেছ কোনওদিন?'

—'আহা, বেচারির যে বড় কষ্ট। একপাল ভাইবোন মানুষ করার জন্য একঘেয়ে কাজ...'

—'তোমার মতো ওরাও তো চাকরিবাকরি করে। পায়ের তলায় মাটিও আছে ওদের। তবু কি খুব ভাল আছে?'

—'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? ওরা ছাড়াও অনেকে তো আছে...মীরাদি...'

—'মীরাদিকে তুমি কতটুকু জানো রাই?'

—'তা অবশ্য জানি না। যাদের অত বিশাল ব্যক্তিত্ব থাকে তাদের সহজে বুঝে ওঠা যায় না?'

—'তবে?'

—'তুমি কী বলতে চাইছ?'

—'তুমি ঘাস চাও না রাই?'

—'হ্যাঁ, সবুজ ঘাস।'

—'আর নিজস্ব বনভূমি?'

—'যেখানে একটা ঘর থাকবে। আমার ঘর!'

—'পাশে এক স্বচ্ছ সরোবর...?'

—'হুঁউই। সেখানে আমি রোজ ডুব দেব। সকাল বিকেল জলের আয়নায় দেখব নিজেকে।'

—'সেই সরোবর তো তৈরি হয় ভালবাসার ঝরনা থেকেই। সিদ্ধার্থ তোমাকে ভালবাসে রাই।'

—'জানি, জানি।'

—'তা হলে ভাবছ কেন?'

—'আরেকজনকে মনে পড়ছে যে। সিদ্ধার্থর স্পর্শে...'

—'তুমি ভুল করছ রাই, নীলাঞ্জন চিরকাল থাকবে সে-ই তিনটে পাহাড়ের ওপারে। তুমি শুধু তার ডাক শুনতে পাবে।'

—'তুমি নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছ?'

—'না রাই, সিদ্ধার্থই সত্যি। হঠাৎ কোনও রাতে ঘুম ভেঙে গেলে জানলা দিয়ে যে কাঁঠালিচাঁপার গন্ধটা তোমার নাকে এসে ঝাপটা মারে, মন অবশ করে দেয়, সেই ফুলটাই শুধু নীলাঞ্জন।'

নতুন করে কাঁপছি আমি। ওই তো সবুজ বনভূমির পারে সরোবরের জল টলটল। জংলি মাদলের শব্দ কাছে, আরও কাছে। টুকরো টুকরো ভালবাসা হয়ে সিদ্ধার্থ ছড়িয়ে গেল পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে। চোখ বন্ধ করলাম,—তবে সিদ্ধার্থই সত্যি হোক। তুমি স্বপ্নে এসো নীলাঞ্জন।

মণিকা দিন সাতেক হল কাঁকনের সিটে এসেছে। অনেক দূরে বাড়ি। জঙ্গিপুরের কাছে কোন গ্রামে। মেয়েটা ওখান থেকেই পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে কলকাতা করপোরেশনে। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে। চুপচাপ মুখ গুঁজে পড়ে থাকে বিছানায়। শ্বশুরবাড়িতে কী সব ঝামেলা, ওর বর ওকে নেয় না। মাঝে মাঝে মেয়েটার পাশে গিয়ে বসি, কিছু বলার চেষ্টা করি, যেভাবে কাঁকন বোঝাত আমাকে। ঠিক ঠিক ভাষা খুঁজে পাই না সবসময়। কিন্তু আমি জানি ও পারবে...

মণিকার মধ্যে এক বছর আগের রাইকিশোরীকে দেখতে পাচ্ছি আমি।